কালা বদর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দি গ্লোব লাইব্রেরী
২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৫৫ সাল

প্রকাশক : প্রফুল্লকুমার বসু

গ্লোব লাইব্রেরী

[illegible]২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :—নন্দগোপাল ঘোষ

উৎপল প্রেস

১১০।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মূল্য : আড়াই টাকা

শিশু-সাহিত্যের কিরীটি রায়

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বন্ধুবরেষু

টোপ, শৈব্যা, ইজ্জৎ, অপঘাত, বন্দুক শিল্পী,

৺শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু, উস্তাদ মেহেরা খাঁ

ও কালাবদর।

টোপ

সকালে একটা পার্সেল এসে পৌঁছেচে। খুলে দেখি একজোড়া জুতো।

না, শত্রুপক্ষের কাজ নয়। একজোড়া পুরোনো ছেঁড়া জুতো পাঠিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতার চেষ্টাও করেনি কেউ। চমৎকার, ঝকঝকে বাঘের চামড়ার নতুন চটি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, পায়ে দিতে লজ্জা বোধ হয় দস্তুরমতো। ইচ্ছে করে বিছানায় শুইয়ে রাখি।

কিন্তু জুতোজোড়া পাঠাল কে? কোথাও অর্ডার দিয়েছিলাম বলেও তো মনে পড়ছে না। আর বন্ধুদের সব কটাকেই তো চিনি, বিনামূল্যে এমন একজোড়া জুতো পাঠাবার মতো দরাজ মেজাজ এবং ট্যাঁক কারো আছে বলেও জানি না। তাহলে ব্যাপারটা কী?

খুব আশ্চর্য হব কিনা ভাবছি, এমন সময় একখানা সবুজ রঙের কার্ড চোখে পড়ল। উইথ্ বেস্ট কম্প্লিমেণ্ট্স্ অব্ রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরী, রামগঙ্গা এস্টেট্।

আর তখনি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আট মাস আগেকার এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকারকাহিনী।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আলাপের ইতিহাসটা ঘোলাটে, সূত্রগুলো এলোমেলো। যতদূর মনে হয়, আমার এক সহপাঠী তাঁর এস্টেটে চাকরি করত। তারই যোগাযোগে রাজাবাহাদুরের এক জন্মবাসরে আমি একটা কাব্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলাম। ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস

চুরি করে যে প্রশস্তি রচনা করেছিলাম তার দুটো একটা লাইন এই রকম :

ত্রিভুবন প্রভা কর ওহে প্রভাকর,
গুণবান্ মহীয়ান্ হে রাজেন্দ্রবর।
ভূতলে অতুল কীর্তি রামচন্দ্র সম—
অরাতিদমন ওহে তুমি নিরুপম।

কাব্যচর্চার ফললাভ হল একেবারে নগদ নগদ। পড়েছি—আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খান্‌খানান হিন্দী কবি গঙ্গের চার লাইন কবিতা শুনে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। দেখলাম সে নবাবী মেজাজের ঐতিহ্যটা গুণবান্ মহীয়ান্ অরাতিদমন মহারাজ এখনো বজায় রেখেছেন। আমার মতো দীনাতিদীনের ওপরেও রাজদৃষ্টি পড়ল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, প্রায়ই চা খাওয়াতে লাগলেন, তারপর সামান্য একটা উপলক্ষ্য করে দামী একটা সোনার হাতঘড়ি উপহার দিয়ে বসলেন এক সময়ে। সেই থেকে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে আছি আমি। নিছক কবিতা মেলাবার জন্যে যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে সুরু করেছি।

রাজাবাহাদুরকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর গুণগ্রাহী লোককে শ্রদ্ধা করাই তো স্বাভাবিক। বন্ধুরা বলে, মোসাহেব। কিন্তু আমি জানি ওটা নিছক গায়ের জ্বালা, আমার সৌভাগ্যে ওদের ঈর্ষ্যা। তা আমি পরোয়া করি না। নৌকা বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড়ঝাপটার [illegible]তে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তাই মাস আষ্টেক আগে রাজাবাহাদুর যখন শিকারে তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন তখন তা আমি ঠেলতে পারলাম না। কলকাতার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে

পড়া গেল। তাছাড়া গোরা সৈন্যদের মাঝে মাঝে রাইফেল উঁচিয়ে শকুন মারতে দেখা ছাড়া শিকার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই আমার। সেদিক থেকেও মনের ভেতরে গভীর এবং নিবিড় একটা প্রলোভন ছিল।

জঙ্গলের ভেতরে ছোট একটা রেললাইনে আরো ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। নামবার সঙ্গে সঙ্গে সোনালী তকমা আঁটা ঝক্‌ঝকে পোযাক পরা আর্দালি এসে সেলাম দিল আমাকে। বলল—হুজুর, চলুন।

স্টেশনের বাইরে মেটে রাস্তায় দেখি মস্ত একখানা গাড়ি—যার পুরো নাম রোল্‌স রয়েস, সংক্ষেপে যাকে বলে 'রোজ'। তা 'রোজ'ই বটে। মাটিতে চলল না রাজহাঁসের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। চামড়ার খট্‌খটে গদী নয়, লাল মখমলের কুশন। হেলান দিতে সংকোচ হয়, পাছে মাথার সস্তা নারকেল তেলের দাগ ধরে যায়। আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়—সমস্ত পৃথিবীটা চাকার নিচে মাটির ডেলার মতো গুঁড়িয়ে যাক—আমি এখানে সুখে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারি।

হাঁসের মতো ভেসে চলল 'রোজ'। মেটে রাস্তায় চলেছে অথচ এতটুকু ঝাঁকুনি নেই। ইচ্ছে হল একবার ঘাড় বার করে দেখি গাড়িটা ঠিক মাটি দিয়েই চলেছে, না দুহাত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওর চাকাগুলো।

পথের দুপাশে তখন নতুন একটা জগতের ছবি। সবুজ শালবনের আড়ালে আড়ালে চা-বাগানের বিস্তার। চকচকে উজ্জ্বল পাতার শান্ত, শ্যামল সমুদ্র। দূরে আকাশের গায়ে কালো পাহাড়ের রেখা।

ক্রমশ চা-বাগান শেষ হয়ে এল, পথের দুপাশে ঘন হয়ে দেখা

দিতে লাগল অবিচ্ছিন্ন শালবন। একজন আর্দালি জানাল, হুজুর ফরেস্ট এসে পড়েছে।

ফরেস্টই বটে। পথের ওপর থেকে সূর্যের আলো সরে গেছে, এখন শুধু শান্ত আর বিষণ্ণ ছায়া। রাত্রির শিশির এখনও ভিজিয়ে রেখেছে পথটাকে। 'রোজে'র নিঃশব্দ চাকার নিচে মড়মড় করে সাড়া তুলছে শুকনো শালের পাতা। বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো শালের ফুল ঝরে পড়ছে পথের পাশে, উড়ে আসছে গায়ে। কোথা থেকে চকিতের জন্যে ময়ূরের তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে এল। দুপাশে নিবিড় শালের বন। কোথাও কোথাও ভেতর দিয়ে খানিকটা খানিকটা দৃষ্টি চলে, কখনো কখনো বুনো ঝোপে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে এক এক টুকরো কাঠের গায়ে লেখা ১৯৩৫, ১৯৪০। মানুষ বনকে শুধু উচ্ছন্ন করতে চায় না, তাকে বাড়াতেও চায়। এই সব প্লটে বিভিন্ন সময়ে নতুন করে শালের চারা রোপণ করা হয়েছে, এ তারই নির্দেশ।

বনের রূপ দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝে ভয়ও যে না করছিল এমন নয়। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ যদি গাড়ির এঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়, আর তাক বুঝে যদি লাফ মারে একটা বুনো জানোয়ার তা হলে—

তা হলে পকেটের ফাউণ্টেন পেনটা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোনো অস্ত্রই সঙ্গে নেই।

শেষটায় আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম—হাঁরে, এখানে বাঘ আছে?

ওরা অনুকম্পার হাসি হাসল।

—হাঁ, হুজুর।

—ভালুক?

রাজা-রাজড়ার সহবৎ, কাজেই যতটুকু জিজ্ঞাসা করব ঠিক ততটুকুই উত্তর। ওরা বলল—হাঁ হুজুর।

—অজগর সাপ ?

—জী মালিক।

প্রশ্ন করবার উৎসাহ ওই পর্যন্তই এসে থেমে গেল আমার। যে রকম দ্রুত উত্তর দিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো প্রশ্নই যে 'না' বলে আমাকে আশ্বস্ত করবে এমন তো মনে হচ্ছে না। যতদূর মনে হচ্ছিল গরিলা, হিপোপোটেমাস, ভ্যাম্পায়ার কোনো কিছুই বাকি নেই এখানে। জুলু কিংবা ফিলিপিনোরাও এখানে বিষাক্ত বুমেরাং বাগিয়ে আছে কিনা এবং মানুষ পেলে তারা বেগুনপোড়া করে খেতে ভালোবাসে কিনা এজাতীয় একটা কুটিল জিজ্ঞাসাও আমার মনে জেগে উঠেছে ততক্ষণে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম।

খানিকটা আসতেই গাড়িটা ঘস্ করে ব্রেক কষল একটা। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম—কিরে, বাঘ নাকি ?

আর্দালিরা মুচকি হাসল—না হুজুর, এসে পড়েছি।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো। এসে পড়েছি সন্দেহ নেই। পথের বাঁ দিকে ঘন শালবনের ভেতরে একটুখানি ফাঁকা জমি। সেখানে কাঠের তৈরী বাংলো প্যাটার্নের একখানি দোতলা বাড়ি। এই নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত।

গাড়ির শব্দে বাড়িটার ভেতর থেকে দু-তিন জন চাপরাশী বেরিয়ে এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম বাড়ির সামনে চওড়া একটা গড়খাই কাটা। লোকগুলো ধরাধরি করে মস্ত বড় একফালি কাঠ খাদটার ওপরে সাঁকোর মতো বিছিয়ে দিল। তারই ওপর দিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরীর হাণ্টিং বাংলোর সামনে।

আরে আরে কী সৌভাগ্য। রাজাবাহাদুর স্বয়ং এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন আমার অপেক্ষায়। এক গাল হেসে বললেন, আসুন আসুন, আপনার জন্য আমি এখনো চা পর্যন্ত খাইনি।

শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। মুখে কথা জোগাল না, শুধু বেকুবের মতো কৃতার্থতার হাসি হাসলাম একগাল।

রাজাবাহাদুর বললেন—এত কষ্ট করে আপনি যে আসবেন সে ভাবতেই পারিনি। বড় আনন্দ হল, ভারী আনন্দ হল। চলুন, চলুন, ওপরে চলুন।

এত গুণ না থাকলে কি আর রাজা হয়! একেই বলে রাজোচিত বিনয়।

রাজাবাহাদুর বললেন—আগে স্নান করে রিফ্রেশ্‌ড্ হয়ে আসুন, টি ইজ গেটিং রেডি। বোয়, সাহাবকো গোসলখানামে লে যাও।

চল্লিশ বছরের দাড়িওয়ালা বয় নিঃসন্দেহে বাঙালী। তবু হিন্দী করে হুকুমটা দিলেন রাজাবাহাদুর, কারণ ওটাই রাজকীয় দস্তুর। বয় আমাকে গোসলখানায় নিয়ে গেল।

আশ্চর্য, এই জঙ্গলের ভেতরেও এত নিখুঁত আয়োজন এমন একটা বাথরুমে জীবনে আমি স্নান করিনি। ব্র্যাকেটে তিন চারখানা সদ্য-পাট-ভাঙা নতুন তোয়ালে, তিনটে দামী সোপ কেসে তিন রকমের নতুন সাবান, র‍্যাকে দামী দামী তেল, লাইম জুস। অতিকায় বাথ্‌টাব—ওপরে ঝাঁঝরি। নিচে টিউব ওয়েল থেকে পাম্প করে এখানে ধারাস্নানের ব্যবস্থা। একেবারে রাজকীয় কারবার—কে বলবে এটা কলকাতার গ্র্যাণ্ড্ হোটেল নয়!

স্নান হয়ে গেল। ব্র্যাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিল্কের লুঙ্গি, আদ্দির পাজামা। দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলাম।

বয় বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, নিয়ে গেল ড্রেসিং রুমে। ঘরজোড়া আয়না, পৃথিবীর যা কিছু প্রসাধনের জিনিস কিছু আর বাকি নেই এখানে। ড্রেসিং রুম থেকে বেরুতে সোজা ডাক পড়ল রাজা-বাহাদুরের লাউঞ্জে। রাজাবাহাদুর একখানা চেয়ারে চিত হয়ে শুয়ে ম্যানিলা চুরুট খাচ্ছিলেন। বললেন, আসুন চা তৈরী।

চায়ের বর্ণনা না করাই ভালো। চা, কফি, কোকো, ওভ্যালটিন, রুটি, মাখন, পনির, চর্বিতে জমাট ঠাণ্ডা মাংস। কলা থেকে আরম্ভ করে পিচ্ পর্যন্ত প্রায় দশ রকমের ফল।

সেই গন্ধমাদন থেকে যা পারি গোগ্রাসে গিলে চললাম আমি। রাজাবাহাদুর কখনো এক টুকরো রুটি খেলেন, কখনো একটা ফল। অর্থাৎ কিছুই খেলেন না, শুধু পর পর কাপ তিনেক চা ছাড়া। তারপর আর একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—একবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখুন।

দেখলাম। প্রকৃতির এমন অপূর্ব রূপ জীবনে আর দেখিনি। ঠিক জানালার নিচেই মাটিটা খাড়া তিন চারশো ফুট নেমে গেছে, বাড়িটা যেন ঝুলে আছে সেই রাক্ষুসে শূন্যতার ওপরে। তলায় দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল, তার মাঝ দিয়ে পাহাড়ী নদীর একটা সঙ্কীর্ণ নীলোজ্জ্বল রেখা। যতদূর দেখা যায়, বিস্তীর্ণ অরণ্য চলেছে প্রসারিত হয়ে ; তার সীমান্তে নীল পাহাড়ের প্রহরা।

আমার মুখ দিয়ে শুধু বেরুল—চমৎকার।

রাজাবাহাদুর বললেন—রাইট্। আপনারা কবি মানুষ, আপনাদের তো ভালো লাগবেই। আমারই মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে মশাই! কিন্তু নিচের ওই যে জঙ্গলটি দেখতে পাচ্ছেন ওটি বড় সুবিধের জায়গা নয়। টেরাইয়ের ওয়ান্ অব্ দি ফিয়ার্সেস্ট্ ফরেস্ট্স্। একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব।

আমি সভয়ে জঙ্গলটার দিকে তাকালাম। ওয়ান অব্ দি ফিয়ার্সেস্ট্! কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। চারশো ফুট নিচে ওই অতিকায় জঙ্গলটাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন বেঁটে গাছের ঝোপ বলে মনে হচ্ছে, নদীর রেখাটাকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল একখানা পাতের মতো। আশ্চর্য সবুজ, আশ্চর্য সুন্দর। অফুরন্ত রোদে ঝলমল করছে অফুরন্ত প্রকৃতি—পাহাড়টা যেন গাঢ় নীল রঙ্ দিয়ে আঁকা। মনে হয়, ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ওই স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্য যেন আদর করে বুকে টেনে নেবে—রাশি রাশি পাতার একটা নরম বিছানার ওপরে। অথচ—

আমি বললাম—ওখানেই শিকার করবেন নাকি?

—ক্ষেপেছেন, নামব কী করে! দেখছেন তো, পেছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনো শিকারীর বন্দুক গিয়ে পৌঁছোয়নি। তবে হ্যাঁ, ঠিক শিকার করি না বটে, আমি মাঝে মাঝে মাছ ধরি ওখান থেকে।

—মাছ ধরেন!—আমি হাঁ করলাম। মাছ ধরেন কী রকম? ওই নদী থেকে নাকি?

—সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। দরকার হলে পরে দেখতে পাবেন—রাজাবাহাদুর রহস্যময়ভাবে মুখ টিপে হাসলেন: আপাতত শিকারের আয়োজন করা যাক, কিছু না জুটলে মাছের চেষ্টাই করা যাবে। তবে ভালো টোপ ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, আর তাতে অনেক হাঙ্গাম।

—কিছু বুঝতে পারছি না।

রাজাবাহাদুর জবাব দিলেন না; শুধু হাসলেন। তারপর ম্যানিলা চুরুটের খানিকটা সুগন্ধি ধোঁয়া ছড়িয়ে বললেন—আপনি রাইফেল ছুঁড়তে জানেন?

বুঝলাম, কথাটাকে চাপা দিতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাকে দমন করে ফেললাম আমি, এরপরে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে না, শোভনও নয়। সেটা কোর্ট ম্যানারের বিরোধী।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন—রাইফেল ছুঁড়তে পারেন?

বললাম—ছেলে বেলায় এয়ার গান ছুঁড়েছি।

রাজাবাহাদুর হেসে উঠলেন—তা বটে। আপনারা কবি মানুষ, ওসব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার আপনাদের মানায় না। আমি অবশ্য বারো বছর বয়সেই রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আপনি চেষ্টা করে দেখুন না, কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

উঠে দাঁড়ালেন রাজাবাহাদুর। ঘরের একদিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমি দেখলাম—এ শুধু লাউঞ্জ্ নয়, রীতিমতো একটা ন্যাচারাল্ মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাগার। খাওয়ার টেবিলেই নিমগ্ন ছিলাম বলে এতক্ষণ দেখতে পাইনি, নইলে এর আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

চারদিকে সারি সারি নানা আকারের আগ্নেয়াস্ত্র। গোটাচারেক রাইফেল, ছোট বড় নানা রকম চেহারা। একটা হুকের সঙ্গে খাপে আঁটা এক জোড়া রিভলভার ঝুলছে; তার পাশেই ঝুলছে খোলা একখানা লম্বা শেফিল্ডের তরোয়াল—সূর্যের আলোর মতো তার ফলার নিষ্কলঙ্ক রঙ্। মোটা চামড়ার বেল্টে ঝকঝকে পেতলের কার্তুজ—রাইফেলের, রিভলভারের। জরিদার খাপে খানতিনেক নেপালী ভোজালি। আর দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, নানা রকমের চামড়া—বাঘের, সাপের, হরিণের, গো-সাপের। একটা টেবিলে অতিকায় হাতীর মাথা—দুটো বড় বড় দাঁত এগিয়ে আছে সামনের দিকে। বুঝলাম—এরা রাজাবাহাদুরের বীরকীর্তির নিদর্শন।

ছোট একটা রাইফেল তুলে নিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন—এটা লাইট জিনিস। তবে ভালো রিপিটার ; অনায়াসে বড় বড় জানোয়ার ঘায়েল করতে পারেন।

আমার কাছে অবশ্য সবই সমান। লাইট রিপিটার যা, হাউইট্‌জার কামানও তাই। তবু সৌজন্য রক্ষার জন্যে বলতে হল—বাঃ, তবে তো চমৎকার জিনিস।

রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে : তা হলে চেষ্টা করুন। লোড করাই আছে, ছুঁড়ুন ওই জানালা দিয়ে। আমি সভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেলাম! জীবনে বেকুবি অনেক করেছি, কিন্তু তার পরিমাণটা আর বাড়াতে প্রস্তুত নই। যুদ্ধ-ফেরৎ এক বন্ধুর মুখে তাঁর রাইফেল ছোঁড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা শুনেছিলাম—পড়ে গিয়ে পা ভেঙে নাকি তাঁকে একমাস বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। নিজেকে যতদূর জানি—আমার ফাঁড়া শুধু পা ভাঙার ওপর দিয়েই কাটবে বলে মনে হয় না।

বললাম—ওটা এখন থাক, পরে হবে না হয়।

রাজাবাহাদুর মৃদু কৌতুকের হাসি হাসলেন। বললেন—এখন ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু একবার ধরতে শিখলে আর ছাড়তে চাইবেন না। হাতে থাকলে বুঝবেন কতবড় শক্তিমান আপনি। ইউ ক্যান্ ইজিলি ফেস্ অল দ্য রাস্কেল্স অব্—অব্।

হঠাৎ তাঁর চোখ ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। মৃদু হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে উঠল মুখের পেশীগুলো : অ্যাণ্ড এ রাইভ্যাল্—

মুহূর্তে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। রাজাবাহাদুরের দুচোখে বন্য হিংসা, রাইফেলটা এমন শক্ত মুঠিতে বাগিয়ে ধরেছেন যেন সামনে কাউকে গুলি করবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন তিনি। উত্তেজনার ঝোঁকে আমাকেই যদি লক্ষ্যভেদ করে বসেন তা হলে—

আতঙ্কে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। কিন্তু ততক্ষণে মেঘ কেটে গেছে—রাজা-রাজড়ার মেজাজ! রাজাবাহাদুর হাসলেন।

—ওয়েল, পরে আপনাকে তালিম দেওয়া যাবে। সবই তো রয়েছে, যেটা খুশি আপনি ট্রাই করতে পারেন। চলুন, এখন বারান্দায় গিয়ে বসা যাক, লেট্‌স্ হ্যাভ সাম এনার্জি।

প্রাতরাশেই প্রায় বিন্ধ্যপর্বত উদরসাৎ করা হয়েছে, আর কী হলে এনার্জি সঞ্চিত হবে বোঝা শক্ত। কিন্তু কথাটা বলেই রাজাবাহাদুর বাইরের বারান্দার দিকে পা বাড়িয়েছেন। সুতরাং আমাকেও পিছু নিতে হল।

বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ার, বেতের টেবিল। এখানে ঢোকবার পরে এত বিচিত্র রকমের আসনে বসছি যে আমি প্রায় নার্ভাস হয়ে উঠেছি। তবু যেন বেতের চেয়ারে বসতে পেয়ে খানিকটা সহজ অন্তরঙ্গতা অনুভব করা গেল। এটা অন্তত চেনা জিনিস।

আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল এনার্জি কথাটার আসল তাৎপর্য কী। বেয়ারা তৈরীই ছিল, ট্রেতে করে একটি ফেনিল গ্লাস সামনে এনে রাখল—অ্যাল্‌কোহলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে গেল বাতাসে।

রাজাবাহাদুর স্মিত হাস্যে বললেন—চলবে?

সবিনয়ে জানালাম, না।

—তবে বিয়ার আনাবো? একেবারে মেয়েদের ড্রিঙ্ক! নেশা হবে না।

—নাঃ থাক। অভ্যেস নেই কোনোদিন।

—হুঁঃ, গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাওয়া ছেলে! রাজাবাহাদুরের স্বরে অনুকম্পার আভাস: আমি কিন্তু চোদ্দ বছর বয়সেই প্রথম ড্রিঙ্ক ধরি।

রাজা-রাজড়ার ব্যাপার—সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা। সুতরাং মন্তব্য অনাবশ্যক। ট্রে বারবার যাতায়াত করতে লাগল। রাজাবাহাদুরের প্রখর উজ্জ্বল চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে এল ক্রমশ, ফর্সা গোলাপী রং ধরল। হঠাৎ অসুস্থ দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

—আচ্ছা বলতে পারেন, আপনি রাজা নন কেন ?

এরকম একটা প্রশ্ন করলে বোকার মতো দাঁত বের করে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। আমিও তাই করলাম।

—বলতে পারলেন না ?

—না।

—আপনি মানুষ মারতে পারেন ?

এ আবার কী রকম কথা ! আমার আতঙ্ক জাগল।

—না।

—তা হলে বলতে পারবেন না। ইউ আর্ অ্যাব্‌সোলিউট্‌লি হোপলেস।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন রাজাবাহাদুর। বলে গেলেন: আই পিটি ইউ।

বুঝলাম নেশাটা বেশ চড়েছে। আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ করে বসে রইলাম সেখানেই। খানিক পরেই ঘরের ভেতরে নাক ডাকার শব্দ। তাকিয়ে দেখি তাঁর লাউঞ্জের সেই চেয়ারটায় হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন রাজাবাহাদুর, মুখের কাছে কতকগুলো মাছি উড়ছে ভনভন করে।

* * *

সেই দিন রাত্রেই শিকারের প্রথম অভিজ্ঞতা।

জঙ্গলের ভেতরে বসে আছি মোটরে। দুটো তীব্র হেড লাইটের

আলো পড়েছে সামনের সঙ্কীর্ণ পথে আর দুধারের শাল বনে। ওই আলোক রেখার বাইরে অবশিষ্ট জঙ্গলটায় যেন প্রেত-পুরীর জমাট অন্ধকার। রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারদিকে—অনুভব করছি সমস্ত স্নায়ু দিয়ে। এখানে হাতীর পাল ঘুরছে দূরের কোনো পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে, ঝোপের ভেতরে অজগর প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হয়ে আছে হরিণের পাল আর কোনো একটা খাদের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। কালো রাত্রিতে জেগে আছে কালো অরণ্যের প্রাথমিক জীবন।

রোমাঞ্চিত ভীত প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে আছি মোটরের মধ্যে। কিন্তু হিংসার রাজত্ব শালবন ডুবে আছে একটা আশ্চর্য স্তব্ধতায়। শুধু কানের কাছে অবিশ্রান্ত মশার গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে—শালের পাতায় উঠছে এক একটা মৃদু মর্মর। আর কখনো কখনো ডাকছে বনমুরগী, ঘুমের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে ময়ূর। মনে হচ্ছে এই গভীর ভয়ঙ্কর অরণ্যের ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলো যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা নিশ্চিত কোনো মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে আছে।

আমরাও প্রতীক্ষা করে আছি। মোটরের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে বসে আছি আমরা—একটি কথা বলবার উপায় নেই। রাইফেলের একটা ঝকঝকে নল এঞ্জিনের ওপরে বাড়িয়ে দিয়ে শিকারী বাঘের মতোই তাকিয়ে আছেন রাজাবাহাদুর। চোখদুটো উদগ্র প্রখর হয়ে আছে হেড লাইটের তীব্র আলোক রেখাটার দিকে, একটা জানোয়ার ওই রেখাটা পেরুবার দুঃসাহ স করলেই রাইলে গর্জন করে উঠবে।

কিন্তু জঙ্গলে সেই আশ্চর্য স্তব্ধতা। অরণ্য যেন আজ রাত্রে বিশ্রাম করছে, একটি রাত্রের জন্যে ক্লান্ত হয়ে জানোয়ারগুলো ঘুমিয়ে

পড়েছে খাদের ভেতরে, ঝোপের আড়ালে। কেটে চলেছে মন্থর সময়। রাজাবাহাদুরের হাতের রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িটা একটা সবুজ চোখের মত জ্বলছে, রাত দেড়টা পেরিয়ে গেছে। ক্রমশ উসখুস করছেন উৎকর্ণ রাজাবাহাদুর।

—নাঃ হোপলেস। আজ আর পাওয়া যাবেনা।

বহুদূর থেকে একটা তীক্ষ্ণ গম্ভীর শব্দ, হাতীর ডাক। ময়ূরের পাখা ঝাপটানি চলছে মাঝে মাঝে। এক ফাঁকে একটা প্যাঁচা চেঁচিয়ে উঠল, রাত্রি ঘোষণা করে গেল শেয়ালের দল। কিন্তু কোথায় বাঘ, কোথায় বা ভালুক? অন্ধকার বনের মধ্যে দ্রুত কতকগুলো খুরের আওয়াজ—পালিয়ে গেল হরিণের পাল।

কিন্তু কোনো ছায়া পড়ছেনা আলোকবৃত্তের ভেতরে। মশার কামড় যেন অসহ্য হয়ে উঠছে।

—বৃথাই গেল রাতটা।—রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বরে পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি ভেঙে পড়ল: ডেভিল্ লাক। সীটের পাশ থেকে একটা ফ্লাস্ক তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে ঢাললেন গলাতে, ছড়িয়ে পড়ল হুইস্কির উগ্র কটু গন্ধ।

—থ্যাঙ্ক হেভন্স।—রাজাবাহাদুর হঠাৎ নড়ে বসলেন চকিত হয়ে। নক্ষত্রবেগে হাতটা চলে গেল রাইফেলের ট্রিগারে। শিকার এসে পড়েছে।

আমিও দেখলাম। বহুদূরে আলোর রেখাটার ভেতরে কী একটা জানোয়ার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন একটা জোরালো আলো চোখে পড়াতে কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে, তাকিয়ে আছে এই দিকেই। দুটো জোনাকির বিন্দুর মতো চিক চিক করছে তার চোখ।

ড্রাইভার বললে—হায়না।

—ড্যাম।—রাইফেল থেকে হাত সরিয়ে নিলেন রাজাবাহাদুর। কিন্তু পর মুহূর্তেই চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন—থাক, আজ ছুঁচোই মারব।

দুম্ করে রাইফেল গর্জন করে উঠল। কানে তালা ধরে গেল আমার, বারুদের গন্ধে বিস্বাদ হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র। অব্যর্থ লক্ষ্য রাজাবাহাদুরের—পড়েছে জানোয়ারটা।

ড্রাইভার বললে—তুলে আনব হুজুর?

বিকৃতমুখে রাজাবাহাদুর বললেন, কী হবে? গাড়ি ঘোরাও।

রেডিয়াম ডায়ালের সবুজ আলোয় রাত তিনটে। গাড়ি ফিরে চলল হান্টিং বাংলোর দিকে। একটা ম্যানিলা চুরুট ধরিয়ে রাজাবাহাদুর আবার বললেন—ড্যাম!

কিন্তু কী আশ্চর্য—জঙ্গল যেন রসিকতা সুরু করেছে আমাদের সঙ্গে। দিনের বেলা অনেক চেষ্টা করেও দুটো একটা বনমুরগী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেলনা—এমনকি একটা হরিণ পর্যন্ত নয়। নাইট্-শুটিংয়েও সেই অবস্থা। পর পর তিন রাত্রি জঙ্গলের নানা জায়গায় গাড়ি নামিয়ে চেষ্টা করা হল, কিন্তু নগদ লাভ যা ঘটল তা অমানুষিক মশার কামড়। জঙ্গলের হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ মিললনা বটে, কিন্তু মশাগুলোকে চিনতে পারা গেল। এমন সাংঘাতিক মশা যে পৃথিবীর কোথাও থাকতে পারে এতদিন এ ধারণা ছিলনা আমার।

তবে মশার কামড়ের ক্ষতিপূরণ চলতে লাগল গন্ধমাদন উজাড় করে। সত্যি বলতে কি, শিকার করতে না পারলেও মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিলনা আমার। জঙ্গলের ভেতরে এমন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন কল্পনারও বাইরে। জীবনে এমন দামী খাবার কোনো দিন মুখে তুলিনি, এমন চমৎকার বাথরুমে স্নান করিনি কখনো, এত পুরু জাজিমের বিছানায় শুয়ে অস্বস্তিতে প্রথম দিন তো

ঘুমুতেই পারিনি আমি। নিবিড় জঙ্গলের নেপথ্যে গ্র্যাণ্ড হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছি—শিকার না হলেও কণামাত্রও ক্ষতি নেই আমার। প্রত্যেক দিনই লাউঞ্জে চা খেতে খেতে চারশো ফুট নিচেকার ঘন জঙ্গলটার দিকে চোখ পড়ে। সকালের আলোয় উদ্ভাসিত শ্যামলতা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে অপরূপ প্রসন্নতায়। ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট্ ফরেস্ট্স্! বিশ্বাস হয় না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি বাতাসে আকারঅবয়বহীন পত্রাবরণ সবুজ সমুদ্রের মত দুলছে, চক্র দিচ্ছে পাখির দল—এখান থেকে মৌমাছির মতো দেখায় পাখিগুলোকে ; জানালার ঠিক নিচেই ইস্পাতের ফলার মতো পাহাড়ী নদীটার নীলিমোজ্জ্বল রেখা—দুটো একটা নুড়ি ঝকমক করে মণিখণ্ডের মতো। বেশ লাগে।

তার পরেই চমক ভাঙে আমার। তাকিয়ে দেখি ঠোঁটের কোণে ম্যানিলা চুরুট পুড়ছে, অস্থির চঞ্চল পায়ে রাজাবাহাদুর ঘরের ভেতরে পায়চারি করছেন। চোখে মুখে একটা চাপা আক্রোশ—ঠোঁট দুটোয় নিষ্ঠুর কঠিনতা। কখনো একটা রাইফেল তুলে নিয়ে বিরক্তিভরে নামিয়ে রাখেন, কখনো ভোজালি তুলে নিয়ে নিজের হাতের ওপরে ফলাটা রেখে পরীক্ষা করেন সেটার ধার, আবার কখনো বা জানালার সামনে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিচের জঙ্গলটার দিকে। আজ তিন দিন থেকে উল্লেখযোগ্য একটা কিছু শিকার করতে পারেননি—ক্ষোভে তাঁর দাঁতগুলো কড়মড় করতে থাকে।

তার পরেই বেরিয়ে যান এনার্জি সংগ্রহের চেষ্টায়। বাইরের বারান্দায় গিয়ে হাঁক দেন—পেগ।

কিন্তু পরের পয়সায় রাজভোগ খেয়ে এবং রাজোচিত বিলাস করে বেশি দিন কাটানো আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। রাজাবাহাদুরের অনুগ্রহ একটা দামী জিনিস বটে, কিন্তু কলকাতায় আমার ঘর-সংসার

আছে, তার একটা দায়িত্ব আছে। সুতরাং চতুর্থ দিন সকালে কথাটা আমাকে পাড়তে হল।

বললাম, এবারে আমাকে বিদায় দিন রাজাবাহাদুর।

রাজাবাহাদুর সবে চতুর্থ পেগে চুমুক দিয়েছেন তখন। তেমনি অসুস্থ আর রক্তাভ চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আপনি যেতে চান ?

—হাঁ, কাজকর্ম রয়েছে—

—কিন্তু আমার শিকার আপনাকে দেখাতে পারলাম না।

—সে না হয় আর একবার হবে।

—হুম্। চাপা ঠোঁটের ভেতরেই একটা গম্ভীর আওয়াজ করলেন রাজাবাহাদুর: আপনি ভাবছেন আমার ওই রাইফেলগুলো, দেওয়ালে ওই সব শিকারের নমুনা—ওগুলো সব ফার্স ?

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, না, না, তা কেন ভাবতে যাব। শিকার তো খানিকটা অদৃষ্টের ব্যাপার—

—হুম্!—অদৃষ্টকেও বদলানো চলে।—রাজাবাহাদুর উঠে পড়লেন: আমার সঙ্গে আসুন।

দুজনে বেরিয়ে এলাম। রাজাবাহাদুর আমাকে নিয়ে এলেন হাণ্টিং বাংলোর পেছন দিকটাতে। ঠিক সেখানে—যার চারশো ফুট নিচে টেরাইয়ের অন্যতম হিংস্র অরণ্য বিস্তীর্ণ হয়ে আছে।

এখানে আসতে আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। দেখি কাঠের একটা রেলিং দেওয়া সাঁকোর মতো জিনিস সেই সীমাহীন শূন্যতার ওপরে প্রায় পনেরো ষোলো হাত প্রসারিত হয়ে আছে। তার পাশে দুটো বড় বড় কাঠের চাকা, তাদের সঙ্গে হুক্ লাগানো দুজোড়া মোটা কাছি জড়ানো। জিনিসগুলো কী ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—আসুন। —রাজাবাহাদুর সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। একটা আশ্চর্য বন্দোবস্ত। ঠিক সাঁকোটার নিচেই পাহাড়ী নদীটার রেখা, নুড়ি মেশানো সংকীর্ণ বালুতট তার দুপাশে, তাছাড়া জঙ্গল আর জঙ্গল। নীচে তাকাতে আমার মাথা ঘুরে উঠল। রাজাবাহাদুর বললেন, জানেন এসব কী?

—না।

—আমার মাছ ধরবার বন্দোবস্ত। এর কাজ খুব গোপনে—নানা হাঙ্গামা আছে। কিন্তু অব্যর্থ।

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আজ রাত্রেই বুঝতে পারবেন। শিকার দেখাতে আপনাকে ডেকে এনেছি, নতুন একটা শিকার দেখাব। কিন্তু কোনোদিন এর কথা কা'রো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না।

কিছু না বুঝেই মাথা নাড়লাম—না।

—তা হলে আজ রাতটা অবধি থাকুন। কাল সকালেই আপনার গাড়ির ব্যবস্থা করব। রাজাবাহাদুর আবার হান্টিং বাংলোর সম্মুখের দিকে এগোলেন: কাল সকালের পরে এমনিতেই আপনার আর এখানে থাকা চলবেনা।

একটা কাঠের সাঁকো, দুটো কপিকলের মতো জিনিস। মাছ ধরবার ব্যবস্থা। কাউকে বলা যাবে না এবং কাল সকালেই চলে যেতে হবে! সবটা মিলিয়ে যেন রহস্যের খাসমহল একেবারে। আমার কেমন এলোমেলো লাগতে লাগল সমস্ত। কিন্তু ভালো করে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, রাজাবাহাদুরকে বেশী প্রশ্ন করতে কেমন অস্বস্তি লাগে আমার। অনধিকার চর্চা মনে হয়।

বাংলোর সামনে তিন চারটে ছোট ছোট নোংরা ছেলেমেয়ে

খেলা করে বেড়াচ্ছে, হিন্দুস্থানী কীপারটার বেওয়ারিশ সম্পত্তি। কীপারটাকে সকালে রাজাবাহাদুর শহরে পাঠিয়েছেন, কিছু দরকারী জিনিসপত্র কিনে কাল সে ফিরবে। ভারী বিশ্বাসী আর অনুগত লোক। মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন হুটোপুটি করে ডাক বাংলোর সামনে। রাজাবাহাদুর বেশ অনুগ্রহের চোখে দেখেন ওদের। দোতলার জানলা থেকে পয়সা, রুটি কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন, নিচে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফালুফি করে। রাজাবাহাদুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সকৌতুকে।

আজও ছেলেমেয়েগুলো হুল্লোড় করে তাঁর চারিপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ালো বলল—হুজুর, সেলাম।—রাজাবাহাদুর পকেটে হাত দিয়ে কতকগুলো পয়সা ছড়িয়ে দিলেন ওদের ভেতরে। হরির লুটের মতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

বেশ ছেলেমেয়েগুলি। দুই থেকে আট বছর পর্যন্ত বয়েস। আমার ভারী ভালো লাগে ওদের। আরণ্যক জগতের শাল শিশুদের মতো সতেজ আর জীবন্ত প্রকৃতির ভেতর থেকে প্রাণ আহরণ করে যেন বড় হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যায় ডিনার টেবিলে বসে আমি বললাম, আজ রাত্রে মাছ ধরবার কথা আছে আপনার।

চোখের কোণা দিয়ে আমার দিকে তাকালেন রাজাবাহাদুর। লক্ষ্য করেছি আজ সমস্ত দিন বড় বেশি মদ খাচ্ছেন আর ক্রমাগত চুরুট টেনে চলেছেন। ভালো করে আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা চলেছে তাঁর।

রাজাবাহাদুর সংক্ষেপে বললেন—হুম্।

আমি সসংকোচে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন হবে?

একমুখ ম্যানিলা চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে তিনি জবাব দিলেন—সময়

হলে ডেকে পাঠাব। এখন আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। স্বচ্ছন্দে কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

শেষ কথাটা পরিষ্কার আদেশের মতো শোনালো। বুঝলাম আমি বেশিক্ষণ আজ তাঁর সঙ্গে কথা বলি এ তিনি চান না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলাটা অতিথিপরায়ণ গৃহস্থের অনুনয় নয়, রাজার নির্দেশ। এবং সে নির্দেশ পালন করতে বিলম্ব না করাই ভালো।

কিন্তু অতি নরম জাজিমের বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছে না। মাথার ভেতরে আবর্তিত হচ্ছে অসংলগ্ন চিন্তা। মাছধরা, কাঠের সাঁকো, কপিকল অত্যন্ত গোপনীয়! অতল রহস্য!

তারপর এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন যে চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এল তা আমি নিজেই টের পাইনি।

মুখের ওপরে ঝাঁঝালো একটা টর্চের আলো পড়তে আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। রাত তখন ক'টা ঠিক জানি না। আরণ্যক পরিবেশ নির্জনতায় অভিভূত। বাইরে শুধু তীব্রকণ্ঠ ঝিঁঝিঁর ডাক

আমার গায়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত পড়েছে কার। সে হাতের স্পর্শে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল আমার। রাজাবাহাদুর বললেন—সময় হয়েছে, চলুন।

আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম—ঠোঁটে আঙুল দিলেন রাজাবাহাদুর।

—কোনো কথা নয় আসুন।

এই গভীর রাত্রে এমনি নিঃশব্দ আহ্বান সবটা মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হয়েছে যেন। কেমন একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চিত ভয়ে গা ছমছম করতে লাগল আমার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজাবাহাদুরের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলাম।

হান্টিং বাংলোটা অন্ধকার। একটা মৃত্যুর শীতলতা ঢেকে

রেখেছে তাকে। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক—চারদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মর। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের মধ্যে মোটর থামিয়ে বসে থাকতে আমার ভয় করছিল, আজও ভয় করছে। কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা—এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে আছে ঠিক বুঝতে পারছিনা, অথচ পা-ও সরতে চাইছেনা আমার। মুখের ওপরে একটা টর্চের আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই দুর্বোধ্য কুটিল সংকেত!

টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর আমাকে সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার কাছে নিয়ে এলেন। দেখি তার ওপরে শিকারের আয়োজন। দুখানা চেয়ার পাতা, দুটো তৈরী রাইফেল। দুজন বেয়ারা একটা কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে কী একটা জিনিস নামিয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য রাজাবাহাদুর তাঁর নয় সেলের হাণ্টিং টর্চটা নিচের দিকে ফ্ল্যাশ করলেন। প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে সাদা পুঁটলির মতো কী একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সঙ্গে নেমে যাচ্ছে দ্রুতবেগে।

আমি বললাম, ওটা কী রাজাবাহাদুর ?

—মাছের টোপ।

—কিন্তু এখনো কিছু বুঝতে পারছিনা।

—একটু পরে বুঝবেন। এখন চুপ করুন।

এবারে স্পষ্ট ধমক দিলেন আমাকে। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে হুইস্কির তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে। রাজাবাহাদুর প্রকৃতিস্থ নেই। আর কিছুই বুঝতে পারছিনা আমি—আমার মাথার ভেতরে সব যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। একটা দুর্বোধ্য নাটকের নির্বাক দ্রষ্টার মতো রাজাবাহাদুরের পাশের চেয়ারটাতে আসন নিলাম আমি।

ওপরে ঘন কালো বনান্তের ওপরে ভাঙা চাঁদ দেখা দিল। তার খানিকটা ম্লান আলো এসে পড়ল চারশো ফুট নিচের নদীর জলে, তার ছড়ানো মণিখণ্ডের মতো নুড়িগুলোর ওপরে। আবছা ভাবে যেন দেখতে পাচ্ছি—কপিকলের দড়ির সঙ্গে বাঁধা সাদা পুঁটলিটা অল্প অল্প নড়ছে বালির ওপরে। এক হাতে রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে আছেন, আর এক হাতে মাঝে মাঝে আলো ফেলছেন নিচের পুঁটলিটায়। চকিত আলোয় যেটুকু মনে হচ্ছে—পুঁটলিটা যেন জীবন্ত, অথচ কী জিনিস কিছু বুঝতে পারছি না। এ নাকি মাছের টোপ। কিন্তু কী এ মাছ—এ কিসের টোপ ?

আবার সেই স্তব্ধতার প্রতীক্ষা। মুহূর্ত কাটছে, মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। রাজাবাহাদুরের টর্চের আলো বারে বারে পিছলে পড়ছে নিচের দিকে। দিগন্তপ্রসার হিংস্র অরণ্য ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে তরঙ্গিত একটা সমুদ্রের মতো। নিচের নদীটা ঝকঝক করছে যেন একখানা খাপ খোলা তলোয়ার। অবাক বিস্ময়ে আমি বসে আছি। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। টোপ ফেলে মাছ ধরছেন রাজাবাহাদুর।

অথচ সব ধোঁয়াটে লাগছে আমার। কান পেতে শুনছি—ঝিঁঝিঁর ডাক, দূরে হাতির গর্জন, শালপাতার মর্মর। এ প্রতীক্ষার তত্ত্ব আমার কাছে দুর্বোধ্য। শুধু হুইস্কি আর ম্যানিলা চুরুটের গন্ধ নাকে এসে লাগছে আমার। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ির কাঁটা চলেছে ঘুরে। ক্রমশ যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম, ক্রমশ যেন ঘুম এল আমার। তার পরেই হঠাৎ কানের কাছে বিকট শব্দে রাইফেল সাড়া দিয়ে উঠল—চারশো ফুট নিচ থেকে ওপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল প্রচণ্ড বাঘের গর্জন। চেয়ারটা শুদ্ধ আমি কেঁপে উঠলাম।

টর্চের আলোটা সোজা পড়ছে নুড়িছড়ানো বালির ডাঙাটার ওপরে। পরিষ্কার দেখতে পেলাম ডোরাকাটা অতিকায় একটা বিশাল জানোয়ার সাদা পুঁটলিটার ওপরে একখানা থাবা চাপিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, সাপের মতো ল্যাজ আছড়াচ্ছে অন্তিম আক্ষেপে। ওপর থেকে ইন্দ্রের বজ্রের মতো অব্যর্থ গুলি গিয়ে লেগেছে তার মাথায়। এত ওপর থেকে এমন দুর্নিবার মৃত্যু নামবে আশঙ্কা করতে পারেনি। রাজাবাহাদুর সোৎসাহে বললেন—ফতে!

এতক্ষণে মাছ ধরবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। সোৎসাহে সোল্লাসে বললাম, মাছ তো ধরলেন, ডাঙায় তুলবেন কেমন করে?

—ওই কপিকল দিয়ে। এই জন্যেই তো ওগুলোর ব্যবস্থা।

ব্যাপারটা যেমন বিচিত্র, তেমনি উপভোগ্য। আমি রাজা-বাহাদুরকে অভিনন্দিত করতে যাব, এমন সময়—এমন সময়—পরিষ্কার শুনতে পেলাম শিশুর গোঙানি। ক্ষীণ অথচ নির্ভুল। ও কিসের শব্দ!

চারশো ফুট নিচ থেকে ওই শব্দটা আসছে। হ্যাঁ—কোনো ভুল নেই! মুখের বাঁধন খুলে গেছে, কিন্তু বড় দেরীতে। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আমি পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার! কী দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?

—চুপ—একটা কালো রাইফেলের নল আমার বুকে ঠেকালেন রাজাবাহাদুর। তার পরেই আমার চারদিকে পৃথিবীটা পাক খেতে খেতে হাওয়ায় গড়া একটা বুদ্বুদের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল! রাজাবাহাদুর ঝাপটে না ধরলে চারশো ফুট নিচেই পড়ে যেতাম হয়তো।

* * *

কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গলটা মেরেছিলেন রাজাবাহাদুর—লোককে ডেকে দেখানোর মতো।

তার আট মাস পরে এই চমৎকার চটিজোড়া উপহার এসেছে। আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম যেমন নরম, তেম্নি আরাম।

৮০

শৈবব্যা

শেষ পর্যন্ত ট্রেনটা যখন রাজঘাটে গঙ্গার পুলের ওপরে এসে উঠল, তখন নীরদা আর চোখের জল রোধ করতে পারল না। তার গালদুটি অশ্রুতে প্লাবিত হয়ে গেল।

চারদিক মুখরিত করে জনতার জয়ধ্বনি উঠেছে। হর হর মহাদেব, জয় বাবা বিশ্বনাথ। যাত্রীরা মুঠো মুঠো করে পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে গঙ্গার জলে। বেণীমাধবের উদ্ধত ধ্বজাদুটো সকালের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, চিতার নীলাভ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে দুনিরীক্ষ্য মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে। অর্ধচন্দ্রাকার গঙ্গার তীরে হিন্দুর তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসী সবে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে।

রাধাকান্ত বিব্রত বোধ করছিলেন। চাপা গলায় বললেন, চুপ কর, সবাই দেখতে পাচ্ছে যে।

আকুল কণ্ঠে নীরদা বললে, দেখুক গে।

—আঃ থাম থাম। কোনো ভয় নেই তোর, আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

সব ঠিক হয়ে যাবে। একথা আগেও অনেক বার বলেছেন রাধাকান্ত। কিন্তু কিছুই ঠিক হয়নি। জটিলতা ক্রমেই বেড়ে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রন্থিমোচন করবার জন্যে রাধাকান্ত নীরদাকে সর্বংসহ পুণ্যভূমি কাশীধামে এনে হাজির করেছেন। তাঁরই বাড়িতে আশ্রিতা বালবিধবা জ্ঞাতির মেয়ের কাছ থেকে বংশধর তিনি কামনা করেননা। ধার্মিক এবং চরিত্রবান্ বলে তাঁর খ্যাতি আছে এবং পত্নী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত সংসার আছে, সর্বোপরি সমাজ তো আছেই। আর যাই হোক তিনি সাধারণ মানুষ—দেবতা নন!

ক্যান্টনমেন্টে এসে ট্রেন থামল। চেনা পাণ্ডাকে আগেই চিঠি দেওয়া ছিল—টাঙ্গা করে সেই নিয়ে গেল কচুরিগলির বাসায়। তারপর যথানিয়মে বেনারসের পুলিশ চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে কুড়িয়ে পেল আর একটি নামগোত্রহীন নবজাতকের মৃতদেহ।

ততদিনে রাধাকান্ত দেশে ফিরে গিয়েছেন। বৈঠকখানায় হুঁকো নিয়ে বসে আলোচনা করছেন নারীজাতির পাপপ্রবণতা সম্পর্কে। বাচস্পতির দিকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, সেই যে হিতোপদেশে আছে না? গাভী যেরূপ নিত্য নব নব তৃণভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ স্ত্রীলোকও—

কদর্য একটা সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে বাচস্পতি রাধাকান্তের বক্তব্যটাকে আরো প্রাঞ্জল করে দিলেন।

এদিকে পাণ্ডা মহাদেব তেওয়ারীর আর ধৈর্য থাকলনা।

একদিন অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে বললে, এবার বেরোও আমার বাড়ি থেকে।

মড়ার চোখের মতো দুটো ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মহাদেবের মুখের ওপরে ফেলে নীরদা কথা বললে। এত আস্তে আস্তে বললে যে বহুযত্নে কান খাড়া করে কথাটা শুনতে হল মহাদেবকে।

গাঁজার নেশায় চড়া মেজাজ মুহূর্তের জন্যে নেমে এল মহাদেবের। ওই অদ্ভুত চোখ দুটো—ওই শবের মত বিচিত্র শীতল দৃষ্টি তার কেমন অমানুষিক বলে মনে হয়, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয় তার। যেন পাথরের ওপরে ঘা দিচ্ছে, পাথরের কিছুই হবেনা, প্রতিঘাতটা ফিরে আসবে তারই দিকে। ভয়, উৎকণ্ঠা, অপমান ও অপরাধ—সবকিছু জড়িয়ে কোন্ একটা নির্বেদলোকে পৌঁছে গেছে নীরদা।

মহাদেব কুঁকড়ে গিয়ে বললে, আজ চার মাহিনা হয়ে গেল টাকা পয়সা কিছু পাইনি। আমি তো আর দানছত্র খুলে বসিনি।

নীরদা তেমনি অস্পষ্ট গলায় বললে, আমি কী করব?

আবার জ্বলে উঠল মহাদেব, বিশ্রী একটা অঙ্গভঙ্গি করে বললে, ডালমণ্ডি থেকে রোজগার করে আনো।—তোমার যৌবন আছে, কাশীতে রেইস আদমিরও অভাব নেই।

কিন্তু কথাটা বলেই মহাদেব আবার লজ্জা পেলো। নীরদার দিক থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেতে যেতে বললে, নইলে পথ দেখো।

পথই দেখতে হবে নীরদাকে। যে পঙ্ককুণ্ড আর গ্লানির ভেতরে তাকে নামিয়ে রেখে রাধাকান্ত সরে পড়েছে, তারপরে পথ ছাড়া কিছু আর দেখবার নেই। যাওয়ার আগে রাধাকান্ত তাঁর অভ্যস্ত রীতিতে সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছিলেন, কোন ভাবনা নেই, মাসে মাসে আমি খরচা পাঠাব। কিন্তু দু মাস পরেই সংসারী রাধাকান্ত, চরিত্রবান্ ভদ্র রাধাকান্ত এই চরিত্রহীনা সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতিটা অবলীলাক্রমে ভুলে যেতে পেরেছেন। না ভুলে যাওয়াটাই আশ্চর্য ছিল।

হিন্দুর পরমতম পুণ্যতীর্থ। ভিখারী বিশ্বনাথের ক্ষুধার্ত করপুটে অমৃত ঢেলে দিচ্ছেন অন্নপূর্ণা। কিন্তু যুগের অভিশাপে অন্নপূর্ণাও ভিখারিনী। বিশ্বনাথের গলিতে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, দেবালয়ের আশে পাশে সহস্র অন্নপূর্ণার কান্না শোনা যায়: একটা পয়সা দিয়ে যা বাবা, বিশ্বেশ্বর তোর ভালো করবেন—

বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে কেউ উপবাসী থাকেনা!

কেউ হয়তো থাকেনা, কিন্তু দু'দিন ধরে নীরদার খাওয়া জোটেনি। বোধ হয় বিশ্বনাথের আশ্রয় সে পায়নি, বোধ হয় নীরদার পাপে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

ক্লান্ত দুর্বল পায়ে বেরিয়ে এল নীরদা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মন্দিরে মন্দিরে আলো জ্বলেছে, আরতি দেখবার আশায় যাত্রীরা রওনা হয়েছে বিশ্বনাথের বাড়ির উদ্দেশ্যে। কর্মব্যস্ত শহরের দোকান-পাটে বিকিকিনি চলেছে, চায়ের দোকানে উঠছে হুল্লোড়, পথ দিয়ে সমানে চলেছে টাঙ্গা, একা, মোটর আর রিকশার স্রোত। বাঙালিটোলা ছাড়িয়ে নীরদা এগিয়ে চলল।

খানিক এগিয়ে যেখানে আলো আর কোলাহল কিছুটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, সেখানে বাঁ দিকে একটা বাঁক নিলে নীরদা। পথ প্রায় নির্জন। খোয়াওঠা নোংরা রাস্তা—সোজা গিয়ে নেমেছে হরিশচন্দ্র ঘাটে। সমস্ত কাশীতে এই ঘাটটাই নীরদার ভালো লাগে, এখানে এসেই যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে।

আগে দু-চার দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে, অহল্যাবাই ঘাটে গিয়ে সে বসেছে। কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয় তার—কেমন যেন মনে হয় ওসব জায়গাতে সে অনধিকারী। ঘাটের চত্বরে চত্বরে যেখানে কীর্তন শোনবার জন্যে পুণ্যকামী নরনারীরা ভিড় জমিয়েছে, ছত্রের নীচে নীচে যেখানে বেদপাঠ আর কথকতা চলছে, সামনে গঙ্গার জলে ভাসছে আনন্দতরণী আর ঘাটের ওপরে পাথরের ভিত-গাঁথা প্রাসাদগুলো বিদ্যুতের আলোয় ইন্দ্রপুরীর মতো জ্বলছে—ওখানকার ওই পরিবেশ নীরদার জন্যে নয়। ওখানে যারা আসে ওরা সবাই শুদ্ধ, সবাই পবিত্র। তাদের জীবনে কখনো মলিনতার এতটুকু আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। ওরা সহজ ভাবে হাসে, সহজ ভাবে কথা বলে; নির্মল নিষ্কলঙ্ক মুখে গলায় আঁচল দিয়ে কথকতা শোনে, কীর্তনের আসরে ওদের চোখ দিয়ে দরদর করে জল নেমে আসে। আর নীরদার চারপাশে কলঙ্কের কালো ছায়া, অশুচিতার স্পর্শ একটা বৃত্তের মতো বেষ্টন করে আছে, মনে হয় সকলের শান্ত পবিত্র দৃষ্টি

মুহূর্তে ঘৃণায় কুটিল কুৎসিৎ হয়ে ওর অপরাধী মুখের ওপর এসে পড়বে।

অদ্ভুত ভাবে নির্জন, আশ্চর্য ভাবে পরিত্যক্ত। পাশেই কেদারেশ্বর শিবের মন্দির থেকে নেমেছে ঝকঝকে চওড়া সিঁড়ির রাশি—ওখানে ভিড় জমিয়েছে দণ্ডীরা, কথকেরা, তীর্থকামীরা, স্বাস্থ্যলোভীরা এবং ভিক্ষুকেরা। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে কেদারের মন্দিরে। ঘাটের ওপরে জ্বলছে জোরালো বিদ্যুতের আলো। কিন্তু তার থেকে দু পা সরে এলেই তরল অন্ধকারের মধ্যে হরিশচন্দ্র ঘাট নির্জনতায় তলিয়ে আছে।

দু তিন বছর আগে জোর বান ডেকেছিল গঙ্গায়। ফেঁপে উঠেছিল, ফুলে উঠেছিল জল—পাহাড় প্রমাণ সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে সে জল ঢুকেছিল শহরের ভেতরে। তারই ফলে পুঞ্জিত বালি হরিশচন্দ্র ঘাটের ভাঙা সিঁড়িগুলোকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। সে বালি কেউ পরিষ্কার করেনি—করবার দরকারই হয়তো বোধ করেনি কেউ। শুধু যারা মড়া নিয়ে আসে তারাই বালির স্তূপ ভেঙে নীচে নেমে যায়, দু একজন দণ্ডী স্নান করে যায় সকালে সন্ধ্যায়। বুড়িরা কচিৎ কখনো হয়তো এসে বসে, তারপর সন্ধ্যা এলেই চলে যায় কেদারঘাটের দিকে। দু একটা চিতার রাঙা আলোতে হরিশচন্দ্রের ছোট মন্দিরটা আলো হয়ে ওঠে—সেই রক্তশিখায় গঙ্গার জলে একটা দীর্ঘ ছায়া ফেলে মাথায় পাগড়ী বাঁধা চণ্ডাল লম্বা বাঁশ দিয়ে চিতা ঝাড়তে থাকে।

এইখানে এসে বসল নীরদা।

ঘাটে জনপ্রাণী নেই। শুধু গঙ্গার ধারে সদ্য নিভে যাওয়া একটা চিতায় যেন রাশি রাশি আগুনের ফুল ফুটে আছে। ওপারের অন্ধকার দিগন্তে চোখে পড়ছে রামনগরের দু একটা আলো।

পেছনে ছিপিটোলার দিক থেকে আসছে উৎকট গানের হুল্লোড়, মদ খেয়েছে ওরা।

নীরদা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিভন্ত চিতাটার দিকে। বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে তার স্থান হলনা। এই জনবিরল ঘাটে—নিঃসঙ্গ শ্মশানে বসে মনে হচ্ছিল একটা পথ ওর খোলা আছে এখনো। বিশ্বনাথ কৃপা করলেন না, কিন্তু শ্মশানে শ্মশানে জেগে আছেন ত্রিশূলপাণি ভয়ালমূর্তি কালভৈরব। চোখের ওপর থেকে যখন পৃথিবীর আলো নিভে যাবে, যখন এই দেহের অসহ্য বোঝাটা টানবার দায় থেকে মুক্তি পাবে সে, তখন চিতার ধোঁয়ার মতো বিশাল জটাজুট এলিয়ে দিয়ে মহাকায় কালভৈরব সামনে এসে দাঁড়াবেন, কানে দেবেন তারকব্রহ্ম নাম।

হঠাৎ মাথার ভেতরটা ঘুরে উঠল নীরদার। মরে যাওয়া স্বামীর মুখ, রাধাকান্তের মুখ আর মহাদেব তেওয়ারীর কদর্য বিকৃত মুখগুলো একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে একটা নতুন মুখের সৃষ্টি করল—কালভৈরবের মুখ। সময় হয়েছে—কালভৈরব এসে দাঁড়িয়েছেন! সামনের অগ্নিময় চিতাশয্যা থেকে আগুনের পিণ্ডগুলো যেন ছটকে লাফিয়ে উঠল, তারপর শ্মশানপ্রেতের লক্ষ লক্ষ চোখের মতো সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ঘাটে, রাশি রাশি বালির ওপর, গঙ্গার কালো জলের উচ্ছল তরঙ্গে তরঙ্গে।

সেই সময় হরিশচন্দ্র মন্দিরের চাতালে বসে একপয়সা দামের একটা সিগারেট খাচ্ছিল জীউৎরাম।

জীউৎরাম চাঁড়ালের ছেলে। বংশানুক্রমিক ভাবে এই ঘাটে তারা মড়া পুড়িয়ে আসছে। কিন্তু জীউৎরামের যৌবনকাল এবং অল্প অল্প সখও আছে। মাঝে মাঝে রুমাল বেঁধে বিলিতী নেটের মিহি পাঞ্জাবী পরে পান চিবুতে চিবুতে সে বেরিয়ে পড়ে, একটুকরো তুলোয় সস্তা

আতর মেখে গুঁজে দেয় কানের পাশে, চোখের পাতায় হালকা করে আঁকে সুর্মার রেখা। এই হরিশচন্দ্র ঘাটে মড়া পোড়ানোর চাইতেও আর একটা বৃহত্তর জীবনের দাবী যে আছে সেইটেকেই সে অনু-ভব করতে চায় মাঝে মাঝে, ভুলে যেতে চায় নিজের ব্রাত্য পরিচয়।

আজ একটু রঙের মুখে ছিল জীউৎরাম। মুসম্মার রস দিয়ে বেশ কড়া করে লোটাখানেক সিদ্ধি টেনেছে, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কোনো অজানা অচেনা 'প্যারে'র উদ্দেশ্যে হৃদয়ের আকুতি নিবে-দন করছে, এমন সময় দেখতে পেলো সিঁড়ির মাথার ওপরে শাদামত কী একটা পড়ে রয়েছে।

প্রথম দু একবার দেখেও দেখেনি, তারপর কেমন সন্দেহ হল। জীউৎরাম আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা—মড়া নয়তো?

একটা ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় পড়ে ছিল নীরদা। পাশের কেদারঘাট থেকে এক ফালি বিদ্যুতের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দুলে যাচ্ছিল নীরদার মুখের ওপর। সেই আলোয় জীউৎ দেখল নিশ্বাস পড়ছে—অজ্ঞান হয়ে গেছে মেয়েটা। কাশীর ঘাটে এমন দৃশ্য বিরল নয়।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কিছু এখনি করা দরকার। কিন্তু কী করতে পারা যায়?

আজ মাথার মধ্যে নেশা রন্‌রন্ করছিল জীউৎরামের—নইলে এমন সে কিছুতেই করতে পারত না। কিছুতেই ভুলতে পারতনা সে চণ্ডাল, তার ছোঁয়া লাগলে বাঙালি ঘরের মেয়েকে চান করতে হয়। কিন্তু আজ সে নেশা করেছিল, খেয়েছিল একমুখ জর্দা দেওয়া মিঠে পান, কানে গুঁজে নিয়েছিল গুলাবী আতর। মনটা অনেকখানি উড়ে চলে

গিয়েছিল তার নিজের সীমানার বাইরে, তার সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধি খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, নিজেকে ভেবে নিয়েছিল ভদ্র-লোকদের সগোত্র বলে।

জীউৎরাম ঝুঁকে পড়ল, পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে নীরদাকে। চণ্ডালের কঠিন বুকের ভেতরে মিশে গেল নীরদার দুর্বল কোমল দেহ—। বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল জীউৎরামের, রোম-কূপগুলো যেন ঝিঁ ঝিঁ করতে লাগল।

নীরদাকে এনে সে নামালো গঙ্গার ধারে। আঁজলা আঁজলা জল দিলে চোখেমুখে। গঙ্গার হাওয়ায় নীরদার জ্ঞান ফিরে এলো ক্রমশ, বিহ্বলের মতো সে উঠে বসল।

—আমি কোথায়?

—হরিশচন্দ্র ঘাটে, গঙ্গাজীর ধারে। কী হয়েছে তোমার?

মুহূর্তে বর্তমানটা নীরদার ঝাপ্সা শাদা চেতনার ওপরে একটা কালো ছায়ার মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জীউৎরাম আবার জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কী হয়েছে?

হঠাৎ নীরদা কেঁদে ফেলল। বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে সে এই প্রথম শুনল বিশ্বনাথের এই কণ্ঠ—শুনল স্নেহের স্বর। দুহাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠল সে।

—আমার কেউ নেই, আমার কিছু নেই—

জীউৎ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কী করা উচিত, কী বলা সঙ্গত কিছু বুঝতে পারছে না। নিভন্ত চিতাটার রাঙা আলোর আভায় নীরদার বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা দেখে একটা কিছু সে অনুমান রেক নিলে।

—তোমার আজ খাওয়া হয়নি, না?

নীরদার আর সংশয় রইল না। সত্যি—কোনো ভুল নেই। শ্মশানচারী বিশ্বেশ্বর ছদ্মবেশে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অশ্রুপ্লাবিত মুখে তেমনি করেই চেয়ে রইল সে।

জীউৎ বললে, তুমি বোসো, আমি আসছি।

দু'পা এগিয়েই কেদারের বাজার। জীউৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে একটা টাকা আর কয়েক আনা খুচরো রয়েছে। কিছু দই, মিষ্টি আর তরী-তরকারী কিনে জীউৎ ফিরে এল।

নীরদা তখনো সেখানে স্তব্ধ একটা মূর্তির মতো বসে ছিল। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল সেই জানে। নীরদার সামনে এসে জীউৎ বললে, এই নাও।

মুখ দিয়ে কথা জোগাচ্ছেনা নীরদার। সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় যেন আচ্ছন্ন, অভিভূত হয়ে গেছে সে। ক্ষণিকের জন্যে মনে হল কোনো বদমতলব নেই তো লোকটার? কিন্তু চিন্তাটা অস্পষ্টভাবে ভেসে উঠেই আবার তলিয়ে গেল। তরল অন্ধকারে ঘেরা হরিশচন্দ্র ঘাট, সামনে গঙ্গার কলোল্লাস, বাতাসে চিতার অস্ফুট গন্ধ আর চার-দিকের একটা থমথমে নিঃসঙ্গতা নীরদার বাস্তব বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, বুকের ভেতর থেকে আকস্মিক একটা আবেগের জোয়ার ঠেলে ঠেলে উঠছে: বাবা বিশ্বনাথের কাশীতে কেউ উপবাসী থাকে না।

আর ভাঙের নেশাটা তখনো থিতিয়ে আছে জীউৎয়ের মগজে। সে যে কী করছে নিজেই জানেনা। এতবড় দুঃসাহস তার কোনো দিন যে হতে পারে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। অনুকম্পা নয়, দয়া নয়, পুরুষের চিরন্তন প্রেরণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার চেতনায়। কেমন যেন মনে হচ্ছে এই সন্ধ্যার শ্মশানের এই পরিবেশে এই মেয়েটি একান্ত তারই কাছে চলে এসেছে—তারই প্রতীক্ষার মধ্যে ধরা দেবার জন্যে।

হাত বাড়িয়ে ঠোঙ্গাটা নিয়ে নীরদা বললে, বিশ্বনাথ তোমার ভালো করবেন। তুমি কে ?

এক মুহূর্তে গলার ভেতরে কী একটা আটকে গেল জীউংয়ের। একবার চেষ্টা করলে মিথ্যা কথা বলবার, চেষ্টা করলে নিজের তুচ্ছ কদর্য পরিচয় গোপন করবার। কিন্তু পরম সত্যাশ্রয়ী মহারাজ হরিশচন্দ্র একদিন যে শ্মশানে দাঁড়িয়ে নিজের ব্রত পালন করে গিয়েছিলেন, শিব চতুর্দশীর রাত্রে যে আদি মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ স্নান করতে আসেন, সেই পুণ্যতীর্থে মিথ্যা কথা সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারল না।

অস্পষ্ট স্বরে জীউং বললে, আমি জীউংরাম।

—তুমি পাণ্ডা ? ব্রাহ্মণ ? দণ্ডবৎ—

যেন সাপে ছোবল মেরেছে এমনিভাবে জীউং পিছিয়ে গেল। চমকে উঠেছে চেতনা, তর্জন করে উঠেছে বংশানুক্রমিক ক্ষুদ্রতা-বোধের সংস্কার। জিভ কেটে জীউং বলে ফেলল, না, আমি চণ্ডাল।

—চণ্ডাল !

জীউংয়ের যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, কোনোক্রমে উচ্চারণ করতে পারল : হুঁ, আমি চণ্ডাল।

—চণ্ডাল ! —বিদ্যুৎবেগে দাঁড়িয়ে উঠল নীরদা। কেদারঘাট থেকে পিছলে পড়া আলোর ফালিতে দেখা গেল অপরিসীম ঘৃণায় নীরদার সমস্ত মুখ কালো হয়ে গেছে। একটা নিষ্ঠুর আঘাতে মুছে গেছে বিশ্বেশ্বরের অলৌকিক মহিমার প্রভাব—সরে গেছে অভিভূত আচ্ছন্নতার জাল।

বিষাক্ত তীক্ষ্ণ গলায় নীরদা চেঁচিয়ে উঠল : চাঁড়াল হয়ে বামুনের বিশ্বনাথকে ছুঁলি তুই ? মুখে জল দিলি ?

সভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেল জীউং।

নীরদা তেমনি চেঁচাতে লাগল : তোর প্রাণে ভয় নেই ? এতবড় সাহস—আমাকে খাবার দিতে আসিস ? তোর মতলব কী বল দেখি ?

জীউৎয়ের পায়ের তলায় মাটি সরতে লাগল।

এক লাথি দিয়ে খাবারগুলো ছড়িয়ে দিলে নীরদা, উল্‌টে দিলে দইয়ের ভাঁড়। তারপর সোজা উঠে হন হন করে হাঁটতে সুরু করলে মদনপুরার রাস্তার দিকে। আর লজ্জায় অপমানে জীউৎ মাটির দিকে তাকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল—তার নেশা ছুটেছে এতক্ষণে। ভাঙা সিঁড়ির ওপর দিয়ে দইয়ের একটা শুভ্র রেখা গড়িয়ে গড়িয়ে বালির মধ্যে গিয়ে পড়তে লাগল।

খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে নীরদার খেয়াল হল, চাঁড়ালে ছুঁয়েছে, গঙ্গাস্নান করে নেওয়া দরকার। কিন্তু ক্ষিদেয় আর তেষ্টায় সমস্ত শরীরটা তার টলছে। বাড়িতে গিয়ে কলেই স্নান করবে একেবারে, এখন আর ঘাটের অতগুলো সিঁড়ি ভাঙা সম্ভব নয়।

পথ চলতে চলতে ক্রমাগত মনে হচ্ছিল আজ ভারী রক্ষা পেয়েছে সে। লোকটার মনে কী ছিল কে জানে। নির্জন ঘাটে যা খুশি তাই করতে পারত, টেনে নিয়ে যেতে পারত যেখানে সেখানে। অন্নপূর্ণা রক্ষা করেছেন। উত্তেজনায় রক্ত জ্বল জ্বল করতে লাগল, হরিশচন্দ্র ঘাটের সঙ্গে দূরত্বটা বজায় রাখবার জন্যে যথাসম্ভব দ্রুত বেগে সে চলতে সুরু করে দিলে।

বাড়িতে এসে যখন ঢুকল, সব নির্জন। শুধু তেতলার ঘরে একটা আলো জ্বলছে, আর সমস্ত অন্ধকার। বিশ্বনাথের আরতি দেখতে গেছে সকলে। কলতলায় স্নান সেরে ঘরে ঢুকতে গিয়েই মনে হল, দরজায় শিকল নেই কেন ? ঘর খুললে কে ?

কিন্তু অত কথা ভাববার আর সময় ছিলনা। আর দাঁড়াতে পারছেনা সে, সমস্ত শরীরটা অস্থির করছে, বোঁ বোঁ করে ঘুরছে

মাথাটা। এক ঘটি জল খেয়ে আজ কোনো মতে গড়িয়ে পড়বে, তারপর উপায়ান্তর না দেখলে কাল থেকে না হয় বিশ্বনাথের গলিতেই বসবে হাত পেতে। কাশীতে ভিক্ষা করে খেলেও সুখ।

দরজা খুলে অন্ধকার ঘরে পা দিতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল নীরদা।

যেমন করে জীউৎরাম তাকে বুকে তুলে নিয়েছিল, তার চাইতে অনেক কঠিন, নিষ্ঠুর পেষণে কে তাকে সাপটে ধরেছে। তার মুখে মদের গন্ধ, অন্ধকারে তার চোখ সাপের চোখের মতো জ্বলছে।

ফিস্ ফিস্ করে সে বললে, ডরো মৎ প্যারে, রুপেয়া মিল্ জায়েগা।

নীরদার দুর্বল হতচেতন দেহ বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করলে, আর অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাবধানে টাকাগুলো মুঠো করে ধরলে মহাদেব তেওয়ারী। রেইস্ আদমির প্রাণটা দরাজ আছে, আর পাওনা টাকাটাও তাকে উসুল করতেই হবে। বিশ্বনাথের কাশীতে নীরদাকে ঋণী রেখে সে পাপের ভাগী হতে পারবেনা, তা সে টাকা নীরদা ইচ্ছায় দিক আর অনিচ্ছায়ই দিক।

ঠিক সেই সময় বৈঠকখানার আসরে বসে জিতেন্দ্রিয়ের লক্ষণ-গুলো বাচস্পতিকে বোঝাচ্ছিলেন রাধাকান্ত। সামনে মহাভারতের পাতা খোলা, ব্যাসদেব বলছেন, হে ভীষ্ম, যে পুরুষ ইন্দ্রিয়জয়ে সক্ষম—

কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে জীউৎরাম।

ফর্সা জামা পরেনা, কানে আতর মাখা তুলো গোঁজেনা, এক মুখ পান চিবিয়ে ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করেনা। কোথা থেকে একটা কঠিন রূঢ় আঘাত এসে আকস্মিক ভাবে তাকে নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ও সজাগ করে দিয়েছে।

জীউৎরাম মড়া পোড়ায়। একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে মড়ার মাথাটা ফটাস্ করে ফাটিয়ে দেয়, চিতার কয়লাগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলে দেয় গঙ্গার জলে। কেমন একটা অন্ধ আক্রোশ বোধ করে, বোধ করে একটা অশোভন উন্মাদনা। জীবন্তে যাদের তার স্পর্শ করবার অধিকার পর্যন্ত নেই, চিতার ওপরে তাদের আধপোড়া মৃতদেহগুলোর ওপরে যেন সে প্রতিশোধ নিতে চায়, তাদের অপমান করতে চায়, লাঞ্ছিত করতে চায়।

মাঝে মাঝে যখন অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে, মনে পড়ে যায় নীরদাকে। ঘৃণা-বীভৎস মুখে বলছে: চণ্ডাল। তার পায়ের ধাক্কায় সিঁড়ির ওপরে উল্‌টে পড়েছে দইয়ের ভাঁড়, পরম অবহেলায় গড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ, তার প্রথম নিবেদন।

হঠাৎ জীউৎয়ের শরীরের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠতে চায়, হাতের মুঠিগুলো থাবার মতো কঠিন হয়ে ওঠে। কী হত যদি সেদিন সে তুলে আনত নীরদাকে, যদি জবরদস্তি করত তার ওপরে? কে জানতে পারত, কে কী করতে পারত তার? সেই ভালো হত— তাই করাই উচিত ছিল তার। ভুল হয়ে গেছে, অন্যায় হয়ে গেছে সেদিন।

লাফিয়ে উঠে পড়ে জীউৎ, হাতের বাঁশটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে খোঁচা দেয় চিতার মড়াটাকে। কালো রবারের পুতুলের মতো শিরা-সংকুচিত দেহটা পোড়া কাঠের ভেতর থেকে খানিকটা লাফিয়ে ওঠে—একরাশ আগুন ঝুর ঝুর করে ছড়িয়ে যায় আশে পাশে। তারপর নির্মম ভাবে বাঁশ দিয়ে পিটতে সুরু করে, সাদা হাড়ের ওপর থেকে থেতলে থেতলে পোড়া মাংস খসে পড়তে থাকে —দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে যায়।

কিছুদিন পরে টের পেলো জীউৎয়ের বন্ধু-বান্ধবেরা।

একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, তার মাথার ভেতরে কিছু একটা ঘুরপাক খাচ্ছে। গাঁজার আসরে তারা জীউংকে ঘিরে ধরল।

—কী হয়েছে তোর ?

—কুছ্ নেহি।

—দিল খারাপ ?

—হাঁ—

—তবে চল্, আজ মৌজ করে আসি—

—না—

কিন্তু বন্ধুরা ছাড়লেনা, সেদিন সন্ধ্যার পরেই সাজগোজ করিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেল। দেশী মদের দোকানে এক এক পাঁইট্ করে টেনে সকলে যখন রাস্তায় বেরুল, তখন বহুদিন পরে জীউংয়ের রক্তে আগুন ধরেছে আবার। জোর গলায় একটা অশ্রাব্য গান জুড়ে দিল সে।

ডালমণ্ডিতে ঘরে ঘরে তখন উৎসব চলছে। হার্মোনিয়ামের শব্দ, ঘুঙুরের আওয়াজ, বেতালা গান, বেসুরো চীৎকার। মাঝে মাঝে সব কিছু ছাপিয়ে জেগে উঠছে তবলার উদ্দাম চাঁটির নির্ঘোষ। দরজায় দরজায় রাত্রির অপ্সরী। শিকার ধরবার জন্যে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে।

টলতে টলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল জীউং। কেদারঘাটের এক ফালি আলোতে দেখেছিল, এখানে বিদ্যুতের আলোতেও সে চিনতে পারল। আশ্চর্য, নেশায় রাঙা চোখ নিয়েও চিনতে পারল জীউং।

মেয়েটার চোখেও নেশার ঘোর। জীউংকে থেমে দাঁড়াতে দেখে সে এগিয়ে এল। জীউংয়ের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, চলে এসো—

ঠাণ্ডা একটা সাপ হঠাৎ শরীরে জড়িয়ে গেলে যে অনুভূতি জাগে, তেমনি একটা ন্যক্কারজনক ভয়ার্ত শিহরণে জীউৎ শিউরে উঠল। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বললে, আমি চাঁড়াল।

উচ্চৈস্বরে মাতালের হাসি হেসে মেয়েটা বললে, আমি চাঁড়ালনী। ভয় কি, চলে এসো—

প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে জীউৎরাম —উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে সুরু করে দিলে। পেছন থেকে মেয়েটার হাসি কানে আসছে, একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে যেন পিতলের বাসনের গায়ে সশব্দে আঁচড় কাটছে কেউ।

শ্মশানে শ্মশানচণ্ডাল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সামনে চিতার ওপর লকলকে আগুন—গঙ্গার জলে নাচছে তার প্রেতচ্ছায়া। শ্মশানচণ্ডালের কালো শরীরে আগুনের আভা পিছলে যাচ্ছে।

আর রাগ নেই, অভিযোগ নেই, গ্লানি নেই। ব্যথা আর করুণায় মনের ভেতরটা টলমল করছে। চেতনার ভেতর থেকে কে যেন বলছে একদিন এই ঘাটেই আসবে নীরদা, এইখানে গঙ্গার জলে জীবনের সমস্ত জ্বালা তার জুড়িয়ে যাবে। সেদিন তার অহঙ্কার থাকবেনা, থাকবেনা আজকের এই অপমানের কালো কলঙ্কের ছাপ। সেদিন জীউৎ তাকে নিজের মতো করে পাবে, পাবে তাকে স্পর্শ করবার অধিকার, চণ্ডালের ছোঁয়ায় সেদিন তার কাশীপ্রাপ্তির সার্থক মর্যাদা ফিরে আসবে। সেই দিনের প্রতীক্ষা করবে জীউৎ—অপেক্ষা করে থাকবে সেই দিনের জন্যে।

রাধাকান্তের বাড়িতে তখন কথকতা হচ্ছিল। শ্মশানে চণ্ডাল মহারাজা হরিশচন্দ্রের সঙ্গে রাজরাণী শৈব্যার মিলন।

ইজ্জৎ

সমুদ্রে অনেক দূরে। সেখানে ঝড়, সেখানে সাইক্লোন। আর এখানে, এই এক টুকরো গ্রাম যেন প্রবালদ্বীপ। এর চারদিকে সহজ অশিক্ষা আর অজ্ঞতার শান্তি একটা শুব্ধ লেগুনের মতো প্রবাল-বলয় দিয়ে ঘেরা।

উপমাটা দিয়েছিল গ্রামের ডাক্তার এবং আশপাশের চারখানা গ্রামের মধ্যে একমাত্র এল-এম-এফ ডাক্তার জয়নুদ্দীন মিঞার ছেলে মইনুদ্দীন। সে তখন কলকাতার কলেজে বি-এ পড়ত। তারপর সাত আট বছর পার হয়ে গেছে। সে এখন দূরের মফঃস্বল শহরের উঠ্‌তি উকিল, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বার, একজন নামজাদা নেতা। শান্ত, স্তব্ধ লেগুনের চাইতে মাতাল সমুদ্রের গর্জনই তার ভালো লাগে বেশি।

দূরের সমুদ্রে ঝড়। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, বোম্বাই, পাঞ্জাব। আত্মঘাত আর অপঘাতের রক্তে লাল হয়ে গেল নীল সমুদ্রের জল। প্রবাল-বলয় ভেঙে পড়ল, লেগুনের নিস্তরঙ্গ জলে দেখা দিল মত্ততার আক্রোশ।

ব্রাহ্মণত্বের বিজয়গর্বে প্রায় আধহাতখানেক একটা টিকি মাথার ওপরে গজিয়ে তুলেছে জগন্নাথ সরকার। সেইটেই দুলিয়ে সে বললে, নাঃ, এর প্রতিবিধেন্ করতেই হবে। এমনভাবে চললে দুদিন বাদে সব বাছাধনকেই যে কলমা পড়তে হবে সেটা খেয়াল রেখো।

তরণী মণ্ডল বললে, তা হলে লাঠি ধরতে হয়।

—তাই ধরতে হবে। নিজের মান নিজে না রাখলে কে রাখবে তাই শুনি? গায়ে যতক্ষণ একফোঁটা রক্ত আছে, ততক্ষণ এ ঘটতে দেব না, পরিষ্কার বলে রাখলাম।

কুকুরের ছানার বেঁড়ে একটা ল্যাজের মতো জগন্নাথ সরকারের মাথার ওপরে টিকিটা নড়তে লাগল।

ব্রাহ্মণের অধিকার সম্বন্ধে একটু বেশি মাত্রাতেই সচেতন জগন্নাথ সরকার। খাঁটি ব্রাহ্মণদের কাছে স্বীকৃতিটা নেই বলেই নিজেকে আরো বেশি করে প্রমাণ করতে চায় সে, প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সমুদ্রের ওপারে একটা বিস্তীর্ণ মহাদেশ জুড়ে যেখানে ব্রাহ্মণত্বের বিজয়পতাকা উড়ছে, অস্পৃশ্য নমঃশূদ্রদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-গর্বিত জগন্নাথ সরকারের কোনো পার্থক্য নেই সেখানে. তাই নিজের ছোট গণ্ডিটির ভেতরে নিজেকে সে বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্যের মহিমায় স্থাপিত করে রাখতে চায়। ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার করে কাচা লাল্‌চে রঙের মোটা পৈতের গুচ্ছটা বাগিয়ে ধরে বলে, হেঁ হেঁ বাবা, খাঁটি কাশ্যপগোত্র, রামকিষ্ট ঠাকুরের সন্তান। একটু তপ-তপিস্যে বজায় রাখলে যাকে তাকে ভস্ম করে ফেলতে পারতুম।

কিন্তু তপ-তপস্যাটা এখন আর হয়ে ওঠে না বলেই কাউকে আর ভস্ম করাটাও সম্ভব নয় রামকিষ্ট ঠাকুরের সন্তানের পক্ষে। আর মনু-পরাশরের সঙ্গে যতই আত্মীয়তা সে দাবী করুক না কেন, আসলে সে এখন অন্ত্যজ, সে নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ।

কোন্ সাত না দশ পুরুষ আগে অক্ষত কৌলিন্য স্বনামধন্য রামকিষ্ট ঠাকুরের কোনো বৃদ্ধ প্রপৌত্র লোভ বা অভাবের তাড়নায় নমঃশূদ্রের যাজনা করেছিল। সেই থেকে তারা পতিত। হিন্দুত্বের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য সে পতনকে ক্ষমার চোখে দেখেনি, বিচারও করেনি। একটু একটু করে দিনের পর দিন ঠেলে দিয়েছে পিচ্ছিল পথে, এখন তারা নমঃ'র বামুন।

পৈতে আছে, উপনয়নের ব্যবস্থা আছে, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারের ভাঙা-চুরো অর্থহীন অসঙ্গতিগুলোও জড়িয়ে আছে জীবনের সঙ্গে। শিক্ষা-

দীক্ষা নামে মাত্র, জগন্নাথ সরকার নামটা কাঁচা হাতে সই করতে পারে, তাতে মাত্রা দিতে জানে না, লেখাটা দেখলে নাগরী বলে মনে হয়। চেহারায় ব্রাহ্মণের আর্যত্বের দীপ্তি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রোদে-পোড়া কালো রঙ, লাঙল ঠেলে চওড়া চওড়া হাত দুটো লোহার মতো শক্ত আর কড়া পড়া, পিঠে খড়ি, তামাটে রঙের খাড়া খাড়া চুল, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলে যেমন হয়, তেমনি লালচে আর ঘোলাটে বর্ণের চোখ। বড় বড় অসমান দাঁত, তার দুটো আবার হিন্দুস্থানীদের অনুকরণে রূপো-বাঁধানো। শুধু কুকুরের বেঁড়ে ল্যাজের মতো মাথার টিকিতে ব্রাহ্মণত্বের জয়গৌরব ঘোষিত হচ্ছে।

নমঃশূদ্রদের বিয়েতে, ক্ষেত্রপালের পূজোয় সে-ই মন্ত্র পাঠ করে। সে মন্ত্র বিচিত্র। খাঁটি প্রাদেশিক বাংলার ঘাড়ে কতগুলো অনুস্বার-বিসর্গ চাপিয়ে সেগুলোতে দেবমহিমা আরোপ করা হয়। পিতৃপুরুষের কাছ থেকে যেটুকু পাওয়া গেছে প্রয়োজনমতো তার সঙ্গে নতুন মন্ত্রও জুড়ে নেয় জগন্নাথ সরকার। মোটের ওপর পশার আছে এবং সেজন্যে আত্মমর্যাদা সম্পর্কেও সে পুরোপুরি সজাগ।

আজ সেই আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছে।

বাইরের সমুদ্রে ঝড়। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার। সমস্ত দেশজোড়া একটা অতিকায় ছোরার ঝলক এখানকার আকাশেও বিদ্যুৎচমকের মতো খেলা করে গেল।

অনেকদিন আগে এখানে এক ফকিরের আবির্ভাব হয়েছিল। ফকির নাকি ছিলেন অদ্ভুতকর্মা; সমস্ত হুরী-পরী-জিন ছিল তাঁর আজ্ঞাবহ। হাতে একমুঠো ধুলো নিয়ে তিনি ফুঁ দিতেন—সঙ্গে সঙ্গে সে ধুলো হয়ে যেত খাসা কিস্‌মিস্‌ মনক্কা, কখনো কখনো একেবারে সেরা মোগলাই পোলাও। কতগুলো ঘাসপাতা এক সঙ্গে জড়ো করে নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতেন ফকির, দেখতে দেখতে সেগুলো হয়ে যেত

চুনি, পান্না, হীরে-জহরৎ। সে সব হীরে-জহরতের শেষ পর্যন্ত কী গতি হয়েছে ইতিহাসে তা লেখা নেই, তবে ফকিরের মহিমা লোকের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। আর সব চাইতে যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা এই যে, এহেন করিৎকর্মা মহাপুরুষ কী মনে করে এই অজগর বিজেবনেই তাঁর দেহরক্ষা করলেন।

বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই গ্রামের লোক তাঁর শেষকৃত্য করলে। তাঁর সমাধির ওপর রচনা করলে ছোট একটি গম্বুজ। এখন সে গম্বুজ আর নেই, কয়েকখানা শেওলাধরা ভাঙা ইট ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। কিন্তু তাই বলে ফকিরের মহিমার হ্রাস হয়নি বিন্দুমাত্রও। পুরোনো মদের মতো যতই দিন যাচ্ছে সে মহিমা ততই অলৌকিক হয়ে উঠছে।

ফাঁকা মাঠের ভেতরে টিলার মতো একটুখানি উঁচু জমির ওপরে ফকিরের সমাধি। তা থেকে একটুখানি এদিকে সরে এলে একটা জংলা বটগাছ—এলোমেলোভাবে জটা নামিয়েছে চারপাশে। বহুদিনের পুরোনো গাছ—হয়তো ফকিরের সমসাময়িক, হয়তো তার চাইতেও প্রবীণ। মোটা মোটা ডাল থেকে শিকড় নেমে ঢুকেছে মাটির নীচে—রচনা করেছে কতগুলো স্তম্ভের মতো। সব মিলিয়ে গম্ভীর থমথমে একটা আবহাওয়া। নিবিড় নীলাভ ছায়ার আচ্ছন্নতা, ভিজে ভিজে মাটি, কোটরে কোটরে প্যাঁচার আস্তানা। এইখানে ডাকাতে-কালীর থান।

ফকিরের ইতিহাসের সঙ্গে ডাকাতে-কালীর ইতিহাস একই প্রাচীনতার ঐতিহ্যে গাঁথা। কোন এক নামজাদা ডাকাত এখানে অমাবস্যার রাত্রে নরবলি দিয়ে বেরুত ডাকাতি করতে। এইখানে পঞ্চমুণ্ডী আসন করে সাধনা করতেন রক্তচক্ষু এক মহাকায় তান্ত্রিক। অনেক নরবলির রক্ত এখানকার মাটিতে মিশিয়ে আছে, অনেক

নরমুণ্ড লুকিয়ে আছে এর মাটির তলায়। সুতরাং এখানকার হিন্দুদের কাছে ডাকাতে-কালীর একটা নিশ্চিত ভয়ঙ্কর মর্যাদা আছে। এই গ্রাম তাঁরই রক্ষণাধীনে এবং তাঁর কোপদৃষ্টি পড়লে দেখতে দেখতে সবকিছু উজাড় হয়ে যাবে।

সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে; এতবড় মাঠের ভেতরে এঁরা দু'জন পরস্পরের প্রতিবেশী। ফকির আর ডাকাতে-কালী এতকাল পরম নিশ্চিন্তে এবং নীরবে পাশাপাশি বসবাস করে আসছিলেন। 'এক কম্বলে দশজন ফকিরের জায়গা হয়'—এই প্রবচনটির জন্যেই বোধ হয় এতকাল ফকির কিছুমাত্র আপত্তি করেন নি এবং এত কাছাকাছি যবনের আস্তানা থাকাতেও কালী জাত যাওয়ার আশঙ্কা রাখতেন না। বেশ ছিল।

কিন্তু সমুদ্রে ঝড় এল। প্রবাল-বলয় ভেঙে দোলা জাগিয়ে দিলে নিদ্রিত প্রবাল-দ্বীপে।

মাইল-দেড়েক দূরে মাঝারি গোছের একটা মাদ্রাসা। মাঝখানে একদিন এক মৌলবী সেখানে এসে 'ওয়াজ' করলেন। কী বক্তৃতা দিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু পরের দিন থেকেই আবহাওয়াটা বদলে গেল একেবারে। তারও দু'দিন পরে মুসলমান-পাড়ার 'ধলা মস্তাই' এসে জগন্নাথ ঠাকুরকে জানিয়ে গেল, এবার ডাকাতে-কালীর থানে পূজো করা চলবে না।

—কারণ ?

কারণ, ওখানে ঢাক-ঢোল বাজে। ওখানে ভূত পূজো হয়। তাতে সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত হয় ফকির সাহেবের। জগন্নাথ ঠাকুর বোঝাতে চেষ্টা করলে। বরাবর ওখানে পূজো হয়ে আসছে। এতকাল ফকির সাহেবের যদি কোন অসুবিধে না হয়ে থাকে, এবারেই বা হতে যাবে কেন ?

ধলা মন্তাই হাসল, বললে, তা হোক, অত বুঝি না। তবে এইটে বলতে পারি যে, এবারে ওখানে আর পূজো হতে দেওয়া যাবে না। ওতে আমাদের ধর্মের অপমান।

—কিন্তু আমাদের ধর্মেরও তো অপমান হচ্ছে।

—ভূতপূজো আবার কিসের ধর্ম? ধলা মন্তাইয়ের চোখে হিংসা চকচক করে উঠল: একটা কথা বলে যাই ঠাকুর। এ এখন আমাদের রাজত্ব। আমরা যা বলব তাই করতে হবে। এখন বেশি চালাকি করতে যেয়ো না, বিপদ হতে পারে।

গ্রামে দু'জন মন্তাই। একজন রোগা আর কালো, নিরীহ নির্জীব লোক, সে শুধুই মন্তাই। ধলা মন্তাইয়ের রঙ ওরই ভেতরে একটু ফর্সা, লম্বা তাগড়া চেহারা, চিতানো বুক। মুসলমান-পাড়ার সে সব চাইতে দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, নামকরা দাগী। তাই ধলা মন্তাইয়ের শাসানো শুধু কথার-কথাই নয়।

—যা বললুম ভুলোনা ঠাকুর। পরে গোলমাল হতে পারে।— আর একবার সাবধান করে দিয়ে দলবল নিয়ে ধলা মন্তাই চলে গেল।

তখনকার মতো জগন্নাথ ঠাকুর চুপ করে রইল। কিন্তু চুপ করে থাকা মানেই চেপে যাওয়া নয়। ঘা লাগল ব্রাহ্মণের আত্মমর্যাদায়, কুকুরের ল্যাজের মতো বেঁড়ে টিকিটা উত্তেজনায় খাড়া হয়ে উঠল সজারুর কাঁটার মতো।

নমঃশূদ্রদের গ্রাম। এমনিতেই জাতটা একটু সামরিক, চট করে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মতো নয়। সমাজের সব চাইতে নীচের তলায় পড়ে থাকে বলেই ধর্মের ওপরে আস্থাটা বেশি; শূদ্র-শক্তির বলিষ্ঠ সহজ সংস্কারে একবার যাকে মেনে নিয়েছে তার কাছ থেকে চূড়ান্ত অপমানের আঘাত পেয়েও তাকে ছাড়তে জানে না। যুগ-

দীক্ষা নামে মাত্র, জগন্নাথ সরকার নামটা কাঁচা হাতে সই করতে পারে, তাতে মাত্রা দিতে জানে না, লেখাটা দেখলে নাগরী বলে মনে হয়। চেহারায় ব্রাহ্মণের আর্যত্বের দীপ্তি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রোদে-পোড়া কালো রঙ, লাঙল ঠেলে চওড়া চওড়া হাত দুটো লোহার মতো শক্ত আর কড়া পড়া, পিঠে খড়ি, তামাটে রঙের খাড়া খাড়া চুল, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলে যেমন হয়, তেমনি লালচে আর ঘোলাটে বর্ণের চোখ। বড় বড় অসমান দাঁত, তার দুটো আবার হিন্দুস্থানীদের অনুকরণে রূপো-বাঁধানো। শুধু কুকুরের বেঁড়ে ল্যাজের মতো মাথার টিকিতে ব্রাহ্মণত্বের জয়গৌরব ঘোষিত হচ্ছে।

নমঃশূদ্রদের বিয়েতে, ক্ষেত্রপালের পূজোয় সে-ই মন্ত্র পাঠ করে। সে মন্ত্র বিচিত্র : খাঁটি প্রাদেশিক বাংলার ঘাড়ে কতগুলো অনুস্বার-বিসর্গ চাপিয়ে সেগুলোতে দেবমহিমা আরোপ করা হয়। পিতৃপুরুষের কাছ থেকে যেটুকু পাওয়া গেছে প্রয়োজনমতো তার সঙ্গে নতুন মন্ত্রও জুড়ে নেয় জগন্নাথ সরকার। মোটের ওপর পশার আছে এবং সেজন্যে আত্মমর্যাদা সম্পর্কেও সে পুরোপুরি সজাগ।

আজ সেই আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছে।

বাইরের সমুদ্রে ঝড়। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার। সমস্ত দেশজোড়া একটা অতিকায় ছোরার ঝলক এখানকার আকাশেও বিদ্যুৎচমকের মতো খেলা করে গেল।

অনেকদিন আগে এখানে এক ফকিরের আবির্ভাব হয়েছিল। ফকির নাকি ছিলেন অদ্ভুতকর্মা; সমস্ত হুরী-পরী-জিন ছিল তাঁর আজ্ঞাবহ। হাতে একমুঠো ধুলো নিয়ে তিনি ফুঁ দিতেন—সঙ্গে সঙ্গে সে ধুলো হয়ে যেত খাসা কিসমিস্ মনক্কা, কখনো কখনো একেবারে সেরা মোগলাই পোলাও। কতগুলো ঘাসপাতা এক সঙ্গে জড়ো করে নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতেন ফকির, দেখতে দেখতে সেগুলো হয়ে যেত

চুনি, পান্না, হীরে-জহরৎ। সে সব হীরে-জহরতের শেষ পর্যন্ত কী গতি হয়েছে ইতিহাসে তা লেখা নেই, তবে ফকিরের মহিমা লোকের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। আর সব চাইতে যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা এই যে, এহেন করিৎকর্মা মহাপুরুষ কী মনে করে এই অজগর বিজেবনেই তাঁর দেহরক্ষা করলেন।

বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই গ্রামের লোক তাঁর শেষকৃত্য করলে। তাঁর সমাধির ওপর রচনা করলে ছোট একটি গম্বুজ। এখন সে গম্বুজ আর নেই, কয়েকখানা শেওলাধরা ভাঙা ইট ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। কিন্তু তাই বলে ফকিরের মহিমার হ্রাস হয়নি বিন্দুমাত্রও। পুরোনো মদের মতো যতই দিন যাচ্ছে সে মহিমা ততই অলৌকিক হয়ে উঠছে।

ফাঁকা মাঠের ভেতরে টিলার মতো একটুখানি উঁচু জমির ওপরে ফকিরের সমাধি। তা থেকে একটুখানি এদিকে সরে এলে একটা জংলা বটগাছ—এলোমেলোভাবে জটা নামিয়েছে চারপাশে। বহুদিনের পুরোনো গাছ—হয়তো ফকিরের সমসাময়িক, হয়তো তার চাইতেও প্রবীণ। মোটা মোটা ডাল থেকে শিকড় নেমে ঢুকেছে মাটির নীচে—রচনা করেছে কতগুলো স্তম্ভের মতো। সব মিলিয়ে গম্ভীর থমথমে একটা আবহাওয়া। নিবিড় নীলাভ ছায়ার আচ্ছন্নতা, ভিজে ভিজে মাটি, কোটরে কোটরে প্যাঁচার আস্তানা। এইখানে ডাকাতে-কালীর থান।

ফকিরের ইতিহাসের সঙ্গে ডাকাতে-কালীর ইতিহাস একই প্রাচীনতার ঐতিহ্যে গাঁথা। কোন এক নামজাদা ডাকাত এখানে অমাবস্যার রাত্রে নরবলি দিয়ে বেরুত ডাকাতি করতে। এইখানে পঞ্চমুণ্ডী আসন করে সাধনা করতেন রক্তচক্ষু এক মহাকায় তান্ত্রিক। অনেক নরবলির রক্ত এখানকার মাটিতে মিশিয়ে আছে, অনেক

নরমুণ্ড লুকিয়ে আছে এর মাটির তলায়। সুতরাং এখানকার হিন্দুদের কাছে ডাকাতে-কালীর একটা নিশ্চিত ভয়ঙ্কর মর্যাদা আছে। এই গ্রাম তাঁরই রক্ষণাধীনে এবং তাঁর কোপদৃষ্টি পড়লে দেখতে দেখতে সবকিছু উজাড় হয়ে যাবে।

সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এতবড় মাঠের ভেতরে এঁরা দু'জন পরস্পরের প্রতিবেশী। ফকির আর ডাকাতে-কালী এতকাল পরম নিশ্চিন্তে এবং নীরবে পাশাপাশি বসবাস করে আসছিলেন। 'এক কম্বলে দশজন ফকিরের জায়গা হয়'—এই প্রবচনটির জন্যেই বোধ হয় এতকাল ফকির কিছুমাত্র আপত্তি করেন নি এবং এত কাছাকাছি যবনের আস্তানা থাকাতেও কালী জাত যাওয়ার আশঙ্কা রাখতেন না। বেশ ছিল।

কিন্তু সমুদ্রে ঝড় এল। প্রবাল-বলয় ভেঙে দোলা জাগিয়ে দিলে নিদ্রিত প্রবাল-দ্বীপে।

মাইল-দেড়েক দূরে মাঝারি গোছের একটা মাদ্রাসা। মাঝখানে একদিন এক মৌলবী সেখানে এসে 'ওয়াজ' করলেন। কী বক্তৃতা দিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু পরের দিন থেকেই আবহাওয়াটা বদলে গেল একেবারে। তারও দু'দিন পরে মুসলমান-পাড়ার 'ধলা মস্তাই' এসে জগন্নাথ ঠাকুরকে জানিয়ে গেল, এবার ডাকাতে-কালীর থানে পূজো করা চলবে না।

—কারণ?

কারণ, ওখানে ঢাক-ঢোল বাজে। ওখানে ভূত পূজো হয়। তাতে সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত হয় ফকির সাহেবের। জগন্নাথ ঠাকুর বোঝাতে চেষ্টা করলে। বরাবর ওখানে পূজো হয়ে আসছে। এতকাল ফকির সাহেবের যদি কোন অসুবিধে না হয়ে থাকে, এবারেই বা হতে যাবে কেন?

ধলা মস্তাই হাসল, বললে, তা হোক, অত বুঝি না। তবে এইটে বলতে পারি যে, এবারে ওখানে আর পূজো হতে দেওয়া যাবে না। ওতে আমাদের ধর্মের অপমান।

—কিন্তু আমাদের ধর্মেরও তো অপমান হচ্ছে।

—ভূতপূজো আবার কিসের ধর্ম ? ধলা মস্তাইয়ের চোখে হিংসা চকচক করে উঠল : একটা কথা বলে যাই ঠাকুর। এ এখন আমাদের রাজত্ব। আমরা যা বলব তাই করতে হবে। এখন বেশি চালাকি করতে যেয়ো না, বিপদ হতে পারে।

গ্রামে দু'জন মস্তাই। একজন রোগা আর কালো, নিরীহ নির্জীব লোক, সে শুধুই মস্তাই। ধলা মস্তাইয়ের রঙ ওরই ভেতরে একটু ফর্সা, লম্বা তাগড়া চেহারা, চিতানো বুক। মুসলমান-পাড়ার সে সব চাইতে দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, নামকরা দাগী। তাই ধলা মস্তাইয়ের শাসানো শুধু কথার-কথাই নয়।

—যা বললুম ভুলোনা ঠাকুর। পরে গোলমাল হতে পারে।— আর একবার সাবধান করে দিয়ে দলবল নিয়ে ধলা মস্তাই চলে গেল।

তখনকার মতো জগন্নাথ ঠাকুর চুপ করে রইল। কিন্তু চুপ করে থাকা মানেই চেপে যাওয়া নয়। ঘা লাগল ব্রাহ্মণের আত্মমর্যাদায়, কুকুরের ল্যাজের মতো বেঁড়ে টিকিটা উত্তেজনায় খাড়া হয়ে উঠল সজারুর কাঁটার মতো।

নমঃশূদ্রদের গ্রাম। এমনিতেই জাতটা একটু সামরিক, চট করে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মতো নয়। সমাজের সব চাইতে নীচের তলায় পড়ে থাকে বলেই ধর্মের ওপরে আস্থাটা বেশি; শূদ্র-শক্তির বলিষ্ঠ সহজ সংস্কারে একবার যাকে মেনে নিয়েছে তার কাছ থেকে চূড়ান্ত অপমানের আঘাত পেয়েও তাকে ছাড়তে জানে না। যুগ-

প্রবাহিত রক্তধারায় শম্বুকের নিষ্ঠা, একলব্যের দৃঢ়তা। সমাজের ওপরতলার মানুষদের মতো ধর্মটা ওদের অলঙ্কারমাত্র নয়, একেবারে নীচের তলায় থেকেও ধর্মকে ওরা অহঙ্কার বলে আঁকড়ে রেখেছে।

সুতরাং নমঃ'র বামুন জগন্নাথ সরকার ক্ষেপে উঠেছে।

—পুজো আমরা করবই। তার পরে যা হওয়ার হোক।

একজন বললে, তা হলে সড়কি-টাঙ্গীতে শান দিতে হয়।

জগন্নাথ সরকার হাঁটু চাপড়ে বললে, আলবাৎ। খুন-খারাপী দুটো একটা হয় তো হোক, কিন্তু পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। বেশি বাড়াবাড়ি করে তো ফকির-টকির সবশুদ্ধ উড়িয়ে দেব।

শ্রোতাদের মধ্যে উৎসাহী একজন উঠে দাঁড়াল। রক্তের ভেতরে চন্‌চন্‌ করে উঠেছে নেশা। খুন-খারাপীর নেশা। হিংস্র জন্তুর চৈতন্যের ভেতরে যেন সাড়া দিয়ে উঠেছে আদিম অরণ্যের আহ্বান। সোজা দাঁড়িয়ে উঠে সে বিকট গলায় একটা হাঁক পাড়ল: জয়, কালী মাইকি জয়—

সমবেত জয়ধ্বনি উঠল: কালী মাইকি জয়—

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন দূরের মুসলমান-পাড়া তার জবাব পাঠিয়ে দিলে: আল্লা-হু-আকবর—

জগন্নাথ সরকারের নেতৃত্বে শেষ হল ওদের সভা, ধলা মস্তাইয়ের সভাপতিত্বে শেষ হল মুসলমান-পাড়ার 'ওয়াজ'। সমস্ত মুসলমান-পাড়া আল্লার নামে কসম নিয়েছে, জান দেবে তবু এবার পূজো করতে দেবে না। ইসলামের ইজ্জৎ বাঁচাতে হলে যে করে হোক ওই ভূতপূজো বন্ধ করতে হবে।

আসন্ন ঝড়ের সংকেতে আকাশ থমথম করতে লাগল।

মুসলমান-পাড়ার যিনি আদত মাথা, তিনি হাবিব মিঞা।

নধর গোলগাল চেহারা, টুকটুকে রঙ। সৌখীন মেজাজের

মানুষ। দিল্লী থেকে প্রতি সপ্তাহে সুর্মা আসে, তাঁরা নিজের এবং তাঁর আদরের লালবিবির জন্যে। কানে থাকে আতরভরা তুলো এবং মুখ থেকে বেরোয় মশলা-দেওয়া পানের গন্ধ। পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে হাবিব মিঞার, কিন্তু মনের তারুণ্য এতটুকু ফিকে মারেনি আজ পর্যন্ত। এ অবধি বারোটি বিবি তাঁর হাত ঘুরে গেছে, এখন যে-চারটি আছে তার প্রথমটি হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম, বাকী তিনটি আনকোরা নতুন। পুরোনো জিনিষ বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারেন না হাবিব মিঞা, কিন্তু বড় বিবিকে তালাক দেবার কল্পনাও তিনি করতে পারেননি কখনো। আজ বত্রিশ বছর ঘর করে কেমন একটা মায়া বসে গেছে, তা ছাড়া ধান-পান গোরু-গোয়ালের নিপুণ তদারক করতে এমন আর একটি প্রাণী দুর্লভ।

বড় বিবি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, মাঝখানের দুটি ছায়ামূর্তির মত অবান্তর। মহিষীর মর্যাদা যে সগৌরবে ভোগ করে থাকে সে হল ছোট বিবি বা লালবিবি। বছর সতেরো-আঠারো বয়েস, ছিমছাম চেহারা, মাজা শামলা রঙ। আদরে আবদারে অভিমানে হাবিব মিঞার সমস্ত মন-প্রাণকে একেবারে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। এক মুহূর্তের জন্যে লালবিবিকে চোখের আড়াল করতে পারেন না তিনি। তাই কানের গোলাপী আতর আজকাল আরো বেশি করে গন্ধ ছড়ায়, শহর থেকে জর্দা কিমাম আনানোর খরচটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, চোখের কোলে কোলে আরো গাঢ় হয়ে পড়ছে সুর্মার রেখা। আগের চাইতে আজকাল আরো বেশি করে হাসেন হাবিব মিঞা, ভুঁড়িটা আগের চাইতে আরো বেশি দোল খায়, গালের গোলাপী রঙে আরো বেশি করে যেন যৌবনের আমেজ।

তা সুখী হওয়ার আইন-সঙ্গত অধিকার আছে বইকি হাবিব মিঞার। মস্ত জোত্, ক্ষেতির সময় বারোখানা লাঙল নামে। ইউনিয়ান বোর্ডের মেম্বার, ফুড কমিটির সভাপতি। যা যা দরকার কোনোটার অভাব নেই।

সব ভালো, তবে সন্ধ্যের দিকে একটু আফিং খান। হজমের গোলমালের জন্যে ধরেছিলেন গোড়াতে, এখন পাকাপাকি নেশা হয়ে গেছে। ঘণ্টা-দুত্তিন চোখ বুঁজে নিশ্চিন্তে ঝিমুতে মন্দ লাগে না একেবারে। নেশার আমেজের সঙ্গে নবযৌবনা লালবিবির ধ্যানটা একটা মধুর আরামে আচ্ছন্ন করে রাখে।

বলা বাহুল্য, এই সময় বেরসিকের মতো কেউ ডাকাডাকি করলে ভালো লাগবার কথা নয়। হাবিব মিঞার মেজাজটা যতই ভালো হোক না কেন, ইচ্ছে করে রসভঙ্গকারী বেয়াদবকে পায়ের চটিটা খুলে ঘা-কতক পটাপট বসিয়ে দিতে। খাঁটি সৈয়দের বংশধর হিসেবে গর্জন করে উঠতে ইচ্ছে হয়ঃ চুপ রহো গোলামকা বাচ্ছা—

আপাতত মগজের ভেতরে সেই সৈয়দের মেজাজটা পাক খাচ্ছিল। হাবিব মিঞা গাল দিয়ে উঠলেন না বটে, কিন্তু চোখ না মেলেই দুরস্ত্ জবানীতে আমিরি ভাবায় প্রশ্ন করলেনঃ আবে কৌন্ চিল্লাতা ?

—আমি ধলা মন্তাই, জনাব।

এ এমন একটা লোক যাকে হুঙ্কার দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া চলে না, দেখানো চলে না আমিরি মেজাজের উত্তাপ। অত্যন্ত বদরাগী গোঁয়ার লোক—ক্ষেপে গেলে সৈয়দ মৌলবী কোনোটাই মানবে না। সুতরাং অত্যন্ত অনিচ্ছায় এবং গভীর বিরক্তির সঙ্গে চোখ মেলতে হল, লালবিবির রঙীন স্বপ্নটা আপাতত মিলিয়ে গেল বাতাসে।

জোর করে মুখে হাসি টেনে আনলেন হাবিব মিঞা: তারপর কী খবর ?

দাওয়ার সামনে চাটাইটার ওপরে বসল মস্তাই: আজ্ঞে বারণ করে দিলাম।

—তারপর ?

—গণ্ডগোল পাকাবে। বিকেলে দেখেছি দল বেঁধে জটলা করছিল।

—তোমরা কী করবে ? ভয় পেয়ে সব পিছিয়ে যাবে নাকি ছাগীর বাচ্চার মতো ?

—আল্লার কসম !—পিঁজরার পোষ-না-মানা বাঘের মতো একটা চাপা গর্জন করলে ধলা মস্তাই: আমি জাত-পাঠান জনাব। ধরে ধরে এক-একটাকে কোতল করে দেব তা হলে।

হাবিব মিঞার কণ্ঠস্বর বিশ্বস্ত শোনালো: সব ওই ব্যাটা ঠাকুরের জন্যে। ওই হচ্ছে ওদের মাথা।

—মাথার মাথাটা কেটে নিতে আমার এক লহমা সময় লাগবে না জনাব। তারপরে লাশ গুম করে দেব মধুমতীর জলে। কাকে অবধি টের পাবে না।

—সাবাস !

হাবিব মিঞা চুপ করে গেলেন। মুখে আবার এক টুকরো হাসি দেখা দিল, কিন্তু এ হাসি জোর-করা নয়, সহজ প্রসন্নতার। এতদিনে কাজ হাশিল হবে মনে হচ্ছে। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারবে। নিজে থেকে কিছু করতে গেলে অনর্থক দাঙ্গা-ফৌজদারীর ঝামেলা বাধত, কিন্তু এ যা হচ্ছে তা যেমন নিরাপদ তেমনি মোক্ষম। জগন্নাথ ঠাকুরকে ভাল করেই জানেন হাবিব মিঞা, সহজে তার ন্যায্য দাবী থেকে বাঁধের দেড় বিঘে ধানী জমি ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। কিন্তু যে মন্ত্র দেওয়া হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ

নির্বিঘ্নে জগন্নাথ ঠাকুরের মাথাটা উড়ে যাবে ধড় থেকে এবং তারপরে—

একেই বলে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। ভাগ্যিস মৌলবী সাহেব এসে সেদিন ওই রকম গরম গরম বুলি শুনিয়ে গেলেন, নইলে কি এমন সুযোগ মিলত কোনোদিন! মনে মনে নিজের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন হাবিব মিঞা, তারিফ করলেন নিজেকে। সকলকে লেলিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ সংসারে আর কী আছে।

ধলা মন্তাই বললে, মামলা-মোকদ্দমা যদি বাধে তা হ'লে আপনি তো আমাদের পিছে আছেন জনাব?

—আলবাৎ।—হাবিব মিঞা সোৎসাহে বললেন, সেকথা কি আর বলতে হবে।

আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, বক্তব্যও নেই। তবু দ্বিধা করতে লাগল ধলা মন্তাই, আঙুল দিয়ে চাটাইটাকে খুঁটতে লাগল। আরো কী একটা তার বলবার আছে, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না, বলতে পারছে না সহজ স্পষ্ট ভাষাতে। বাধা আছে, সংকোচ আছে।

—জনাব।

—কী বলছিলে?

—বলছিলাম—মন্তাই আবার চুপ করে গেল।

এতক্ষণে অস্বস্তি বোধ হতে লাগল হাবিব মিঞার। লক্ষণটা খারাপ। সাধারণত এই সব নীরবতার ভূমিকার পরেই আসে প্রার্থীর দরবার—দু' কাঠা ধান চাই, দু'কুড়ি টাকা ধার চাই। এতবড় জোয়ান মানুষটা এমন সংকুচিত হয়ে গেলেই সন্দেহ দেখা দেয়।

—কী বলবে, বলেই ফেল না মিঞা।

—জী—চোয়াড় রুক্ষদর্শন লোকটার মুখচোখ লজ্জিত আর করুণ হয়ে উঠল : জী, ঘরের জরু বিটির যে ইজ্জৎ রইল না।

—ইজ্জৎ রইল না! বল কি হে? তোমার ঘরের ইজ্জতে হাত দেবে এমন বুকের পাটা কার আছে?

—আজ্ঞে সে কথা নয়। কারো হাত দিবার ব্যাপার নয়, দু-একখানা কাপড়—

—কাপড়!—হাবিব মিঞা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন : কাপড়!

—জী, যদি ব্যবস্থা করতে পারেন—

—তুমি ক্ষেপে গেলে মন্তাই?—হাবিব মিঞার বিস্ময় আর বাধা মানল না : সরকারী চালান যা এসেছিল সে তো ছ'মাস আগে লোপাট, একফালি কানি অবধি তার পড়ে নেই। আশমানের চাঁদ যদি চাও তাও টেনে নামিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কাপড় নয়।

—কিছুতেই কি উপায় হয় না, জনাব?

—না, কোনো উপায় হয় না।—হাবিব মিঞা মুখ বিকৃত করে বললেন, শালার কণ্ট্রোল হয়ে সব সর্বনাশ করে দিয়েছে রে। সব গুণাহ্ আর সব না-পাক, দেশটা জাহান্নামে যাবে, বুঝলি?

কিন্তু দেশ জাহান্নামে যাক বা না যাক সেজন্যে মন্তাইকে খুব উৎকণ্ঠিত দেখা গেল না। একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর আদাব জানিয়ে নেমে গেল অন্ধকারে।

হাবিব মিঞা আবার ঘুমোবার জন্যে চোখ বুজলেন। কিন্তু আর আমেজ এলোনা, নেশাটা বিলকুল চটিয়ে দিয়েছে লোকটা। তা হোক, তা হোক। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারবে—এইটেই লাভ। দোষের মধ্যে কাপড়ের জন্য বড্ড ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে। কাপড়? হাবিব মিঞা মৃদু হাসলেন। কাপড় আছে বইকি। কিন্তু জোড়া বত্রিশ টাকা, মন্তাইয়ের পক্ষে তা আকাশের চাঁদের চেয়েও দুরধিগম্য।

অন্ধকার ধানক্ষেতের আল বেয়ে বেয়ে এগিয়ে চলেছে মস্তাই। সদর রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুরতে হয় খানিকটা, এইটেই সোজা পথ। দুপাশে ফলন্ত পাকা ধান পায়ের ওপরে পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে। বাতাসে ধানের গন্ধ। ওই গন্ধে বুকটা ভরে যায়, কেমন শিরশির করে ওঠে রক্ত। আছে, সব আছে। এই ধান, ক্ষেতভরা এত মধুগন্ধী ধান একদিন ওদের সব দিত, দিত কাপড়, দিত মুখের ভাত, বৌ-ঝিকে গড়িয়ে দিত রূপোর পৈঁছে। সে ধান আছে, তেমনি মাতাল-করা গন্ধ আছে তার। আশ্চর্য, তবু কিছু নেই! বৌ-বেটির পরনে কাপড় জোটে না, পেট ভরে না ভাত খেয়ে, কন্দ আর কচু খুঁড়ে বেড়াতে হয় শূয়োরের মতো। আল্লা!

অন্ধকারে ধাক্কা লাগল একটা। আল থেকে হড়কে ধানক্ষেতের ভেতরে নেমে পড়ল মস্তাই।

—কে? চোখে দেখতে পাও না—রাতকানা নাকি?

অন্যদিক থেকে যে আসছিল সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—রাগ কোরো না ভাই, আঁধারে মালুম হয়নি।

—আরে, জগন্নাথ ঠাকুর যে!—

জগন্নাথ ঠাকুর চমকে উঠল। আঁতকে পিছিয়ে গেল তিন পা। ঝড়ের সংকেতে থমথম করছে আকাশ, শুদ্ধ অন্ধকারের নির্জনতায় মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। মস্তাইয়ের আক্রমণের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে জগন্নাথ সরকার।

বুঝতে পেরে এত দুঃখের ভেতরেও হেসে উঠল মস্তাই।

—ভয় পাচ্ছ কেন ঠাকুর? এখানে তোমার সঙ্গে মারামারি করব না। যা কিছু লড়াই-কাজিয়া তা হবে তোমাদেরই ওই কালীর থানে, তখন দেখা যাবে কার কলিজার জোর কত! তা এত রাত্রে চলেছ কোথায়?

জগন্নাথ ঠাকুরের গলায় স্বস্তির আভাস পাওয়া গেল: হাবিব মিঞার কাছে।

—হাবিব মিঞার কাছে!—আশ্চর্য হয়ে মন্তাই বললে, সেখানে কেন? মিটমাটের জন্যে?

—মিটমাট? কিসের মিটমাট?—জগন্নাথের গলার আওয়াজ উগ্র হয়ে উঠল: তোমরাও মরদ, আমরাও মরদ, লাঠিতেই মিটমাট হবে। সেজন্যে নয়, যাচ্ছি দু'খানা কাপড়ের জন্যে।

—কাপড়?

—হ্যাঁ, কাপড়। মান সম্মান আর রইল না মিঞা। বউ দুদিন ঘর থেকে বেরুচ্ছে না। বলছে কাপড়ের জোগাড় না করলে গলা দড়ি দেবে।

মন্তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—কাপড় পাবে না ভাই, তার চেয়ে বউকে গলায় দড়ি দিতে বলো। আমাকেও তাই করতে হবে।

মন্তাই আর দাঁড়াল না, হেঁটে চলে গেল হনহনিয়ে। ধান-ক্ষেতের ভেতরে চুপ করে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল জগন্নাথ—কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করছে যেন।

দিনের আলোয় দেখা গেল সমান উৎসাহে দু'দলই পাঁয়তারা কষছে।

কালী মাই কি জয়—আল্লা-হু-আকবর! রক্তপাত আসছে আসন্ন হয়ে। কোনো বার এ সময় ডাকাতে কালীর থানে পূজো হয় না, কিন্তু এবার কী মানত আছে জগন্নাথ ঠাকুরের, তাই আগামী অমা-বস্যায় পূজো তার না করলেই নয়। মূর্তি তৈরী হচ্ছে কুমোরপাড়াতে, সঙ্গে সঙ্গে শান পড়ছে টাঙ্গী-সড়কি ল্যাজাতে। এবারে এস্পার ওস্পার যা হোক কিছু হয়ে যাবে একটা।

এরা দাঁড়ায় ডাকাতে কালীর থানের পাশে, ঝুরি নামা বটগাছের শান্ত স্যাঁত সেঁতে রহস্যঘন ছায়ায়। অন্ধকার কোটরে আগুনের ভাটার

মতো ধবক্ ধবক্ করে প্যাঁচার চোখ। এই নীলাভ বিচিত্র ছায়ায়, এই গা-ছমছম-করা অস্বস্তিভরা পরিবেশের ভেতরে দাঁড়িয়ে ওদের রক্তে আদিমতার সাড়া আসে। মনে পড়ে যায় অমাবস্যায় নরবলি হত এখানে, থক্থকে রক্ত চাপ বেঁধে থাকত মাটিতে! এখনি আধ হাত জমি খুঁড়লে বেরিয়ে আসবে নরমুণ্ড, দেখা দেবে কবন্ধ-কংকাল। ডাকাতে কালী আজ আবার নতুন করে নরবলি চাইছেন।

ওপারে ফকিরের দরগার সামনে দাঁড়ায় ধলা মস্তাইয়ের দলবল। সমানে শানানো চলছে ল্যাজা-সড়কিতে, বাঁশঝাড় উজোড় করে লাঠি কাটা হচ্ছে, তবে আপাতত শুধু ওদের লক্ষ্য করে যাওয়া। যত খুশি ঘরে বসে মূর্তি তৈরী করো, যত খুশি দল পাকাতে থাকো। কিন্তু থানে মূর্তি বসিয়ে ঢাকে একটা কাঠি দিলেই হয়। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে—সব তৈরী আছে ভেতরে ভেতরে।

চোখ শানিত করে দেখে ধলা মস্তাই, অন্যমনস্কভাবে থুতনির নীচে ছোট দাড়িটা আঁচড়াতে থাকে। ওদিকে কুকুরছানার বেঁড়ে ল্যাজের মতো টিকিটা সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ঠাকুরের মাথায়।

আচমকা চীৎকার ওঠে: কালী মাইকি জয়—

ওদিক থেকে সমান উৎসাহে আসে তার প্রতিধ্বনি: আল্লা-হু-আকবর—

মনে হয় এখনি দাঙ্গা সুরু হল বুঝি। কিন্তু দু' দলই জানে—এখনো সময় হয়নি। এ শুধু পরস্পরকে জানিয়ে দেওয়া, চালাকি চল্‌বে না। আমরাও সতর্ক আছি, আমরাও আছি প্রস্তুত হয়ে। শুধু দেখে যাচ্ছি—শুধু হুঁসিয়ারী দিয়ে যাচ্ছি। যথাসময়ে দেখা যাবে কে কতবড় মরদ।

মুখোমুখি দু'দল। সমান সামরিক, সমান উৎসাহী। দু-চারটে খুন-জখমে কোন পক্ষেরই আপত্তি নেই। জমি নিয়ে, মেয়েমানুষ

নিয়ে যা হামেশাই ঘটে থাকে, ধর্মের জন্যে তার চাইতে আরো কিছু বেশি মূল্য দিতেই রাজী আছে ওরা !

অমাবস্যা যত বেশি এগিয়ে আসছে, চীৎকারের মাত্রা বেড়ে উঠছে তত বেশি। দিনের বেলা পাঁয়তারা কষে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে যায় জগন্নাথ আর মস্তাই। দিনের দুই বীরপুরুষ নেতা সন্ধ্যাবেলায় আশ্চর্য-ভাবে অসহায়। এ এক প্রতিদ্বন্দ্বী—যার বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াবার সামর্থ নেই। শুধু পরাজয়কে মেনে নিতে হচ্ছে—স্বীকার করে নিতে হচ্ছে পৌরুষের মর্মান্তিক অপমানকে। মস্তাইয়ের বৌ শাসায়: একদিন সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে। ঘরের ভেতরে বিনিয়ে বিনিয়ে শোনা যায় জগন্নাথের বোয়ের কান্না: এবারে তার গলায় দড়ি না দিয়ে আর উপায় নেই।

গুম্ হয়ে দু'জনেই বসে থাকে। দু'জনের অবচেতন মনেই হিংস্র সাপের মতো একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা পাক খেয়ে ওঠে: কেমন হয় হাবিব মিঞাকে খুন করলে ?

কিন্তু শত্রুকে আঘাত করতে এখনো ওরা শেখেনি, যা শিখেছে তা শুধু আত্মঘাত।

সকালবেলায় দলবল নিয়ে মস্তাই সবে হাবিব মিঞার বাড়ির দিকে এগিয়েছে, এমন সময় বিশ্রী একটা কান্নার শব্দে পা আটকে গেল সকলের। কান্নাটা আসছে হাবিব মিঞার বাড়ি থেকেই।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সকলে।

সর্বনাশ ঘটে গেছে। কাল রাত্রে একটু ভালোরকম খানা-পিনার ব্যবস্থা হয়েছিল—তৈরী হয়েছিল মাংস-পোলাও। কিন্তু সৈয়দী আমিরী খানার ঝাঁঝ হেলে-চাষার মেয়ে লালবিবি বরদাস্ত করতে পারেনি। শেষ রাত্রে বারকয়েক ভেদ বমি করে তার হয়ে গেছে।

পাগলের মতো বুক চাপড়াচ্ছেন হাবিব মিঞা, তিন বিবি নাকি-সুরে কাঁদবার পাল্লা দিচ্ছে সমস্বরে। এই সুযোগ। এই কান্নার উৎকর্ষের ওপরেই নির্ভর করবে ভবিষ্যতে লালবিবির সৌভাগ্যটা জুটবে কার কপালে।

সমস্ত মুসলমান-পাড়া শোকে বিমূঢ় আর আচ্ছন্ন হয়ে রইল। শোকটা প্রকাশ করতে না পারলে ভবিষ্যতে অসুবিধের সম্ভাবনা আছে। ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল সবাই। গত মন্বন্তরেও বুঝি দেশের এতবড় সর্বনাশ হয় নি।

মহাসমারোহে কবর খোঁড়া হল আল্লাতলীতে। তিন বিবি এসে 'মুর্দা-গোসল' করালো, পড়া হল 'জানাজা'র নামাজ। চমৎকার রঙীন শাড়ী আর ধবধবে চাদরে 'কাফন' করা হল, হাবিব মিঞার বড় আদরের লালবিবি ঘুমিয়ে রইল মাটির তলায়।

দূরে দাঁড়িয়ে হিন্দুরা বিমর্ষ মুখে এই শোকানুষ্ঠান দেখতে লাগল। মনে হল, হাবিব মিঞার শোকে তারাও অভিভূত হয়ে পড়েছে, তাদের গলায় একটিবারও কালীমায়ের জয়ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেলনা। হাজার হোক, ফুড-কমিটির সেক্রেটারী হাবিব মিঞাকে চটানো চলে না।

কেলেঙ্কারীটা হল সেই রাত্রেই।

কে একজন বেশি রাত্রে বেরিয়েছিল ছাগল খুঁজতে। সে এসে চুপি চুপি খবর দিলে হাবিব মিঞাকে। বাঁধের ওপর থেকে দশমীর চাঁদের মেটে মেটে আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কারা যেন আল্লাতলীতে কবর খুঁড়ছে লালবিবির।

জিন? না জিন নয়। নিশ্চয় মানুষ। জ্যোৎস্নায় তাদের ছায়া দেখতে পাওয়া গেছে। জিন হলে ছায়া পড়ত না।

এক হাতে দোনলা বন্দুক আর এক হাতে টর্চ নিলেন হাবিব

মিঞা। ডেকে নিলেন দলবলকে। আমবাগানের ভেতর দিয়ে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল দলটা।

সংবাদটা নির্ভুল। দু'জন লোক। একজন শাবল মারছে, আর একজন মাটি তুলছে। উদ্দেশ্য পরিস্কার, কাফনের কাপড় চুরি করবে।

—ধর, ধর, শালাদের—

লোকদুটো পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। কবরখানার উঁচুনীচু মাটির ঢিবি আর গর্তে পা পড়ে দু'জনেই ধরা পড়ে গেল। তখন দশমীর চাঁদের মেটে মেটে আলোটা এক টুকরো মেঘে ঢাকা পড়েছে, কাফন-চোরদের চিনতে পারা গেল না।

—কোন্ শালা হারামীর বাচ্ছা মুর্দাকে বেপর্দা করতে চায়?

জোরালো টর্চের আলো ফেললেন হাবিব মিঞা।

শুধু লোকদুটো নয়—দলশুদ্ধ সবাই পাথর হয়ে গেছে। টর্চটা খসে গেল হাবিব মিঞার হাত থেকে। একজন সাচ্চা মুসলমানের বেটা ধলা মন্তাই, আর একজন বামুন ঠাকুর জগন্নাথ—মুসলমানের মুর্দা ছুঁলে যাকে গঙ্গা স্নান করতে হয়। ধলা মন্তাইয়ের হাতে শাবল, জগন্নাথের কনুই পর্যন্ত গোরের মাটি।

কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেকে সামলে নিলেন হাবিব মিঞা। বিকৃত বিকট গলায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন: মার, মার, মেরে শালাদের তক্তা করে দে। দু'শালাই কাফের—ইব্‌লিশের বাচ্ছা!

কিন্তু লোকগুলো সব যেন পাথর হয়ে গেছে। মারবার জন্যে কারো হাত উঠল না, এমনকি আঙুলগুলো এতটুকু নড়ল না পর্যন্ত। শুধু সকলের বিস্মিত বিমূঢ় মনে একটা প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে: ফকির আর কালীর ভেতরে এত সহজে মিটমাট হয়ে গেল কেমন করে?

—

অপঘাত

বেথুনের বাস গলির মোড়ে এলেই সোজা বাইরের ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসে সঞ্জীব। তার উৎসুক চোখ দুটো তাকিয়ে থাকে গলিটার দিকে—এখনি প্রজাপতির মতো ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে নমিতা। সদ্য-ফোটা ফুলের মতো এক টুকরো মেয়ে। ঠিক ফুল নয়, ফুলের পাপড়ি। সঞ্জীবের কাব্য করে বলতে ইচ্ছা করে যেন বসন্তের কুঞ্জবন থেকে দক্ষিণা বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে এল।

আর কাব্য করবার মতো মেয়েই বটে। রাজেন্দ্রাণীর মতো দেহশ্রী। সবুজ রঙের রেশমী ফিতে জড়ানো কালো বেণীটি পিঠের সীমানা ছাড়িয়ে অনেকখানি নীচে নেমে এসেছে। কপালে ময়ূরকণ্ঠী রঙের টিপ। দুধে আলতায় মেশানো গায়ের রঙ—যে শাড়ী যে ব্লাউজটি পরে, সেইটেই যেন অদ্ভুত ভাবে শরীরের ছন্দের সঙ্গে মিশে যায়। নিজের মনে মনেই আবৃত্তি করে সঞ্জীব : 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল—

মুনিদের ধ্যান ভাঙুক আর নাই ভাঙুক—সঞ্জীবের যে ধ্যানভঙ্গ হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী। তা ছাড়া সন্ন্যাসীও সে নয়। উর্বশী-মেনকা না হলে যে চিত্ত-বিকার ঘটবেনা এমন কোনো কঠিন ব্রহ্মচর্য ব্রতও সে পালন করছে না। অধিকন্তু উর্বশী যদি জুটেই যায় তা হলে সে যে স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মতোই ভেসে যাবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

না—অসভ্য অভদ্র নয় সঞ্জীব। চোখের দৃষ্টি রাক্ষসের মতো উদগ্র-প্রখর করে তুলে সে সশরীরে নমিতাকে উদরস্থ করতে চায় না, জুতোটাকে সজোরে ঠুকে ঠুকে শিস্ দিয়ে নমিতার দৃষ্টি আকর্ষণ

করবার মতো রুচি-বিকারও তার ঘটেনি। দু চারটে শ্লীল-অশ্লীল মন্তব্য অথবা প্রেম-র্জরিত হৃদয়ের আগ্নেয়গিরির থেকে অগ্ন্যুৎপাতের মতো চটুল গানের উৎপাত করে সে নিজের পৌরুষ প্রতিপন্ন করতে চায়না। সে শিক্ষিত—মেয়েদের স্বাভাবিক সম্মান রাখবার মতো সহজ ভদ্রতাবোধটুকু তার আছে। কিন্তু বেলা সাড়ে দশটার সময় বেথুন কলেজের বাস থেকে পরিচিত হর্ণটা শোনবামাত্র তার ভেতর কী একটা যে ঘটে যায় কে জানে। যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই ছুটে বেরিয়ে আসে, দাঁড়িয়ে থাকে উৎসুক কাতর দৃষ্টি মেলে। রাণীর মতো লঘুছন্দে আসে নমিতা, কপালে কাঁচপোকার টিপটি জ্বলজ্বল করে, পিঠের ওপর সবুজ ফিতে জড়ানো কালো বেণীটি দোলা খেতে থাকে আর তারই তালে তালে দোলে সঞ্জীবের হৃৎপিণ্ড।

মাত্র দু মিনিট থেকে আড়াই মিনিট সময়। এরই ভেতরে, সঞ্জীবের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটি ধরা দিয়ে মিলিয়ে যায় সমস্ত দিনটির জন্যে। বিকেলে অফিস থেকে ফিরতে প্রায়ই দেরী হয়, কখন নমিতা আসে সঞ্জীব জানেনা। শুধু ওই একটিবার দেখা—ওই দেখাটুকুর ভেতরেই যেন মনের পাত্রটি তার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

নমিতা কখনো তাকে লক্ষ্য করে কিনা কে জানে। দু চারদিন তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে, কিন্তু তার ভেতরে কোনো পরিচয়ের আভাসমাত্র নেই। তার দৃষ্টি নিরাসক্ত, নির্বিকার। হয়তো পথে-ঘাটে চলা-ফেরায় প্রতি মুহূর্তে পুরুষের দৃষ্টিবাণ ভোগ করতে হয় বলেই এই নিরাসক্তিটা আয়ত্ত করে নিতে হয় মেয়েদের। ট্রামে যেতে যেতে যেমন ঘর-বাড়ি গাড়ি-ঘোড়া কতগুলো অর্থহীন ছবির মতো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়,, নমিতার কাছে তার চাইতে বেশি কিছু মূল্য নেই সঞ্জীবের। একটা ল্যাম্পপোষ্ট অথবা ট্রাম-ষ্টাণ্ডের সংকেত-লিপি মাত্র।

তবু সঞ্জীব হতাশ হয়না। যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকু লাভ। রূপের তীর্থ দুয়ারে ভিখারী হয়ে থেকেই সে খুশি—একটি কটাক্ষের প্রসাদও যদি না মেলে তবে তার জন্যে ক্ষোভ করে লাভ নেই। যেটুকু সে পায়, সেটুকুকে আশ্রয় করে বহু শূন্য মুহূর্ত নানা বিচিত্র স্বপ্ন-কল্পনায় ভরে তোলে সঞ্জীব,—অতন্দ্র রাত্রি আমন্থর হয়ে ওঠে কল্পনার জাল বুনে।

শেষ পর্যন্ত কথাটা কানে গেল বন্ধু পরিমলের।

পরিমল চিরকালই একটু বেপরোয়া। কলেজে যতদিন পড়েছে, সহপাঠিনীদের ততকাল সে জ্বালিয়ে মেরেছে। মেয়েদের পিছু নেওয়া তার বাতিকের মতো ছিল। গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছে, সুবিধে না হলে টেলিফোনে পরিচয় জমাবার প্রয়াস পেয়েছে। কালি ঢেলে রেখেছে মেয়েদের বেঞ্চে, গোবেচারা অধ্যাপকের ক্লাসে চিঠি ছুঁড়েছে মেয়েদের লক্ষ্য করে। আর লিখেছে হাজারখানেক প্রেমপত্র—গর্ব করে নিজের অজস্র প্রেমকাহিনীর গল্প বন্ধু-বান্ধবদের শুনিয়েছে। সঞ্জীব পরিমলকে যে কোনোকালে খুব অনুরাগের চোখে দেখেছে তা নয়; কিন্তু এই ডন-জুয়ানটির নানা অভিজ্ঞতা সঞ্জীবকে খানিকটা সশ্রদ্ধ করেছে তার সম্পর্কে।

এ হেন দিক্‌পাল পরিমল সঞ্জীবের অসহায় প্রেমের কাহিনীটা শুনতে পেল একদিন।

ঠোঁটের কোণে পাইপ আঁকড়ে ধরে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে দর্শন দিলে পরিমল। বললে, তুই একটা গাধা!

—হঠাৎ!

—হঠাৎ কিরে! প্রেমেই যদি পড়েছিস তাহলে অমন ছোঁক্ ছোঁক্ করে বেড়াচ্ছিস কেন? লেগে যা বুক ঠুকে।

—কী করব?

—এগিয়ে যা, বল্, আমি তোমাকে চাই।

সঞ্জীব বললে, যাঃ!

—যাঃ, কেন?

—যদি বলে আপনি আমাকে চাইতে পারেন, কিন্তু আপনাকে আমি চাই না?

—হুঁঃ! মুখে একটা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক ভঙ্গি করলে পরিমল: আরে রাখ! ওদের এখনো চিনিসনি। প্রেমে পড়বার লোভ পুরুষের চাইতে ওদের ঢের বেশি, ফাঁদে পড়বার জন্যে পা বাড়িয়েই আছে সারাক্ষণ। শুধু লজ্জায় বলতে পারেনা।

সঞ্জীব চুপ করে রইল। কথাটা সে বিশ্বাস করতে রাজী নয়, বিশ্বাস করা একান্ত অসম্ভব তার পক্ষে। রাণীর মতো দেহসৌষ্ঠব নমিতার। কপালের ময়ূরকণ্ঠী টিপটিতে যেন মণি-মুকুটের দীপ্তি। শান্ত-সুন্দর মুখে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার মতো আশ্চর্য মনোরম কমনীয়তা। সেই মেয়ে এত সহজেই সঞ্জীবের প্রেম-নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-সমর্পণ করে বসবে, নমিতাকে এত সুলভ বলে সে কল্পনা করতে পারে না।

কিন্তু পরিমল থামল না। অনর্গল বকে গেল সে, অশ্রান্তভাবে অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করে গেল। কতগুলো অশ্লীল রসিকতা করে গেল সহজ স্বচ্ছ গলায়। নর-নারীর সম্পর্কের রোমান্স্‌হীন একটিমাত্র শারীরিক রূপকেই সত্য বলে জেনেছে পরিমল। ফ্রয়েড্‌, লিণ্ড্‌সে, মারী ষ্টোপস্‌ আর হ্যাভেলক এলিসের বাছা বাছা উদ্ধৃতির একটা জীবন্ত এবং প্রগলভ্‌ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া।

বিশ্রী বিরক্তি বোধ হচ্ছিল সঞ্জীবের। ইচ্ছে করছিল ঘাড় ধরে বার করে দেয় এই বর্বরটাকে, কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠল না। নিজে খানিকটা দুর্বলচিত্ত বলেই সে ভয় করে তার শক্রতাকে। যখন

তখন যা তা স্ক্যাণ্ডাল্ রটিয়ে বেড়াতে পারে—যেখানে সেখানে যা খুশি বলে আসতে পারে তার নামে। পরিমলের অসাধ্য কাজ নেই কিছু।

ওঠবার সময় পরিমল উদারকণ্ঠে বললে, তোর জন্যে ভারি সহানুভূতি বোধ হচ্ছে। দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা।

সঞ্জীব শঙ্কিত হয়ে উঠল। ত্রস্ত স্বরে বললে, যাক্ ভাই, তোকে কিছু করতে হবে হবেনা। পাড়ার মেয়ে, শেষকালে—

চুরুটের একরাশ ধেঁায়া সঞ্জীবের মুখের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে পরিমল বললে, থাম, থাম। পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ কেন বাবা ? আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবেনা, দাড়ি গজাবার আগে থেকে এসব করে আসছি। কত ধানে কত তুষ বেরোয় তা আমার জানা আছে।

পাইথনের চামড়ার চটিটাকে ভঙ্গি করে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল পরিমল।

সঞ্জীব বসে রইল বিমর্ষ মলিন মুখে। হতভাগা পরিমল কী কেলেঙ্কারী ঘটিয়ে বসবে কে জানে। আর লোকটাও আশ্চর্য—টের পেলো কী করে। হাওয়ার মুখে খবর পায় নাকি। প্রতিভাটাকে এদিকে নিয়োজিত না করে কোনো ভালো কাজে লাগালে এতদিনে একটা মহাপুরুষ হয়ে উঠতে পারত পরিমল। কিন্তু ভাগাড় ছাড়া কোনো কিছু আর ওর নজরে পড়বেনা কোনোদিন।

নমিতা। খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইল সঞ্জীব। কালো আকাশে তারার দীপালি জ্বলছে। নীচে হ্যারিসন রোড দিয়ে ট্রাফিকের গর্জন, ট্রামের ঘণ্টির শব্দ। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে পাশের বাড়ির রেডিয়োতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাজছে—অন্তত ওইং গানের ঝঙ্কারটা এসে রণিত হচ্ছে সঞ্জীবের মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।

নমিতা। শুধু পাড়ার মেয়ে নয়—সত্যশরণ চাটার্জির মেয়ে। সত্যশরণবাবু এ অঞ্চলের স্বনামধন্য অ্যাড্‌ভোকেট, এম-এল-এ, নাম করা কংগ্রেস-নেতা। তাঁর ওখানে দন্তস্ফুট করা সঞ্জীবের পক্ষে কোনোদিন কোনো অবস্থায় সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া, তা ছাড়া—

সব চাইতে বড় বাধা সেইখানেই। সঞ্জীবের জীবিকার পরিচয় আজকের দিনে খুব গৌরবের ব্যাপার নয়। কলকাতা পুলিশের সে সাব-ইন্‌স্পেক্টার। হাজার হাজার বিদ্রোহী ছেলেমেয়ের বুকের রক্তে রাঙানো রাজপথ তাকে বুটের নীচে মাড়িয়ে যেতে হয়। ছাত্রমিছিলের সাম্‌নে রিভলভার বাগিয়ে ধরে তাকে পথরোধ করতে হয়। শুধু মনুষ্যত্বের প্রশ্নই নয়, নিজের বিবেক বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্বকেই স্বীকার করা সম্ভব নয় সেখানে। বিদ্যা আছে সঞ্জীবের, বুদ্ধিও আছে। কিন্তু সত্যশরণ চাটার্জির মেয়ের কাছে একটা নেড়ী কুকুরের মূল্যও তার ঢের বেশি। ওদের জগতে সঞ্জীব অস্পৃশ্য, সে চণ্ডাল।

জানালার বাইরে আকাশে অজস্র তারা। নমিতা চিরকাল ওই নক্ষত্রগুলোর মতোই দুরধিগম্য থাকবে তার কাছে। ওই রেডিয়োর গানের মতোই সুর হয়ে তার মনের মধ্যে ধরা দেবে, সত্য হয়ে আসবেনা কোনোদিন। আচ্ছা, চাকরীটা ছেড়ে দেবে সঞ্জীব? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায় দেশে বাপ-মা, ভাই-বোন—তার চাকরীর ওপরে সমস্ত পরিবারটা নির্ভর করে আছে।

জানালাটা বন্ধ করে দিলে সঞ্জীব। টেবিলের টানা থেকে বার করে আনলে রিভল্‌ভারটা। ওইটে দিয়েই তাকে একদিন আত্মহত্যা করতে হবে নাকি! আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে—আজো সারারাত তার ঘুম আসবেনা।…

কিন্তু পরিমল নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলনা। এল দিন তিনেক পরেই।

কাঁধে ষ্ট্রাপে ঝোলানো একটা ক্যামেরা। সোল্লাসে বললে, এগিয়েছি—মাভৈঃ!

কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হলনা সঞ্জীবের। সে শুধু তাকিয়ে রইল বিমূঢ় দৃষ্টিতে।

—সত্যি তোর টেষ্ট্ আছে মাইরি। চমৎকার মেয়েটা। ছবিখানা যা এসেছে—

—ছবি?

—আল্‌বৎ ছবি। এই নে, ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখ। আপাতত এটা তোর সান্ত্বনার ব্যবস্থা হল। তারপর শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পন্থা—

পকেট থেকে একটা এন্‌ভেলপ বাড়িয়ে দিলে পরিমল। আশ্চর্য, নমিতার ছবি। বুকের কাছে বই আর ভ্যানিটি ব্যাগ আঁকড়ে ধরা। বিস্মিত দৃষ্টিতে অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে।

—পেলি কী করে?

—অত্যন্ত সহজে। সামনে দাঁড়িয়ে বাইশ নম্বর বাড়িটা কোথায় জিজ্ঞেস্ করলুম, তারপরেই ক্লিক্!

—কিছু বললে না?

—বলবে আবার কী? কাঁচা ছেলে পেয়েছিস আমাকে! টের পাওয়ার আগেই হাওয়া!

সঞ্জীব তেমনি বিমূঢ়ভাবে বসে রইল।

—মাইরি, তোকে আমার হিংসে হচ্ছে রে! ছবিটার একটা কপি আমারও অ্যাল্‌বামে রেখে দেব। তুই যখন পছন্দ করেছিস, তখন আর ওতে নজর দেবনা, নইলে—

একটা বীভৎস রকমের অশ্লীল মন্তব্য করে তীক্ষ্ণ শব্দে পরিমল হেসে উঠল। আর সেই মুহূর্তে কেমন একটা বিশ্রী বিপর্যয় ঘটে গেল সঞ্জীবের মাথার ভেতরে। আর্তনাদ করে সে দাঁড়িয়ে উঠল,

ছবিটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিলে বাইরে, একটান দিয়ে আছড়ে ফেললে পরিমলের ক্যামেরাটা। চীৎকার করে বললে, রাস্কেল, বেরো, বেরো এক্ষুণি—গেট্ আউট্!

—ব্যাপার কিরে?

—চুপ। আর একটা কথা বলেছিস কি সামনের দাঁতগুলো উড়িয়ে দেব। গেট্ আউট্—

সঞ্জীবের আগ্নেয় চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে লাথি খাওয়া কুকুরের মতো পিছু হটতে হটতে বেরিয়ে গেল পরিমল। দরজার বাইরে থেকে চাপা গর্জনের মতো তার একটিমাত্র কথা শোনা গেল: শালা।

তারপর—তারপর অনেকগুলো দিন কেটে গেল।

মনের দিক থেকে কেমন ক্লান্ত আর অবসন্ন বোধ করছে সঞ্জীব। অদ্ভুত দ্রুত-গতিতে ঘুরে চলেছে সময়টা, কোথাও অপেক্ষা করছে না —অপেক্ষা করছেনা সঞ্জীবের শিথিল অবসন্নতার। তাকে বাদ দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীটা, তার রিভল্‌ভারকে উপেক্ষা করেই আসছে আন্দোলনের পরে আন্দোলন। ২১শে নভেম্বর চলে গেল, চলে গেল আর-আই-এন-ডে, তার পরে ষ্ট্রাইক। সত্যশরণবাবুর সঙ্গে ব্যবধানের সীমারেখাটা আরো বেশি বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে সঞ্জীবের। সুদূর নক্ষত্রের মতো নমিতা—মাটি থেকে একটা নক্ষত্রের দূরত্ব কত? আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল, সেই নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে যদি আলো আসতে হাজার বছর সময় লাগে, তা হলে—

সঞ্জীব কিছু ভাবতে চায়না, ভাবতে ভুলেও গেছে। আরো একটা বছর কেটে গেল। নমিতা বোধ হয় থার্ড-ইয়ারে পড়ে এবারে। রঙীন শাড়ী ছেড়ে আজকাল খদ্দরের শাড়ী ধরেছে, মাঝে মাঝে

গান্ধীটুপি পরে কলেজে যায়। সুদূরের তারাটা ক্রমেই দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠছে। আরো কিছুদিন পরে একেবারে হারিয়ে যাবে দৃষ্টির বাইরে। আকাশে যে রক্তমেঘ ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠছে, তারই আড়ালে নিশ্চিহ্ন ভাবে যাবে মিলিয়ে।

কিন্তু চাকরী ছাড়তে পারবেনা সঞ্জীব। বাপ-মা, ভাই-বোনের মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তার রোজগারের ওপরেই নির্ভর করছে সংসার। হাতে তার যত রক্ত মাখাই থাক—সেই রক্তমাখা টাকাতেই চলবে দিনগত পাপক্ষয়ের শোচনীয় আত্ম-অবক্ষয়। কিন্তু ওই রক্তাক্ত হাতে নমিতার শুভ্র খদ্দরের শাড়ীকে সে কখনো স্পর্শ করতে পারবে না, শুধু সে মুঠোয় তার রিভল্‌ভারটাকেই নিষ্ঠাভরে আঁকড়ে রাখতে পারবে!

সেদিন বিকেলে থানার থেকে বাড়ি ফিরছিল সঞ্জীব।

কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি এসেই তাকে থেমে পড়তে হল। ছাত্র-ছাত্রীর বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে একটা ডাক-ধর্মঘটীদের দাবীতে পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করছে তারা।

নির্নিমেষ চোখে সঞ্জীব তাকিয়ে রইল। বাংলার যৌবন-শক্তি। নানা পতাকার আশ্চর্য সমন্বয়ে সাম্মিলিত শোভাযাত্রা। ওদের চোখে-মুখে জীবনের সজীব উন্মাদনা—ওদের কণ্ঠস্বরে আগামী ঝড়ের সংকেত—সেই ঝড়—যার আসন্ন সম্ভাবনার প্রেতচ্ছায়া দুঃস্বপ্নের মতো এসে পড়েছে সঞ্জীবের চেতনার ওপরে। ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস নেই সঞ্জীবদের—শুধু পরের অস্ত্র হাতে নিয়ে উন্মাদের মতো, অন্ধের মতো ওদের ওপর আঘাত করতে পারে এবং অপেক্ষা করতে পারে সেইদিনের জন্যে—যেদিন এই অস্ত্র ফিরে এসে দ্বিগুণ বেগে প্রতিঘাত করবে।

সিগারেটটা ঠোঁটের কোণে কামড়ে ধরে তাকিয়ে রইল সঞ্জীব।

না, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বরং ওদের মধ্যে নমিতাকে না দেখলেই সে বিস্ময়বোধ করত। সত্যশরণবাবুর মেয়ে, তিনপুরুষ ধরে জেল খেটে আসছে ওরা, নমিতার বড়দা মারা গেছে আন্দামানে। হয়তো নমিতাও তৈরী হচ্ছে জেল খাটবার জন্যে, আন্দামানের জন্যে, লাঠি আর বন্দুকের গুলির জন্যে। সেইটেই স্বাভাবিক—সেইটেই অনিবার্য। দুর্লক্ষ্য নক্ষত্রটির ওপর রক্তমেঘের ছায়া আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে, রেডিয়োর গানটা হারিয়ে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়ার গর্জনের মধ্যে।

চমৎকার লাগছে নমিতাকে। এতদিনে সঞ্জীব তাকে দেখতে পেলো তার সত্যিকারের পরিবেশের ভেতর। শুভ্র সুডোল হাতে পতাকাটি তুলে ধরেছে, রোদে রাঙা হয়ে গেছে অপরূপ কোমল মুখখানা, অসংবৃত অলকগুচ্ছ খেলা করছে গালে-কপালে। রোজ সাড়ে দশটায় কাঁচপোকার টিপ পরে, দীর্ঘ নিবিড় বেণী দুলিয়ে লঘুচ্ছন্দে যে মেয়েটি বেথুনের বাসে এসে ওঠে, তার সঙ্গে এর কোনোখানে এতটুকুও মিল নেই। ছোট একটি প্রদীপের শিখা যেন মশালের আগুন হয়ে জলে উঠেছে এখানে—সঞ্জীবের ঘর তা আলো করবে না, অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দেবে বরং।

—শেম্—শেম্—

সঞ্জীব চমকে উঠল। তাকেই লক্ষ্য করে বলছে ওরা। শেম্ শেম্। তার পরণে ইউনিফর্ম, তার কোমরে রিভলভার। টুপিতে রাজটীকা জলজল করছে। কোনোখানে আত্মগোপন করবার একবিন্দু অবকাশ নেই। সঞ্জীবের মুখে আছড়ে পড়ল এক ঝলক রক্তের উচ্ছ্বাস।

কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সহকর্মী প্রতাপ দাস। কাঁধে তার হাতের স্পর্শ লাগতে, সঞ্জীব চমকে উঠল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো।

—দাঁড়িয়ে কী করছ ব্যানার্জি ?

—দেখছি।

—হুঁ, ভয়ঙ্কর বাড় বেড়েছে। দেশ এবার স্বাধীন করেই ফেলবে দেখছি।

শোভাযাত্রাটা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। নমিতাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার হাতের পতাকাটাকে এতদূর থেকেও চিনতে পারছে সঞ্জীব। অন্যমনস্ক ভাবে বললে, আশ্চর্য নয়।

সঞ্জীবের দৃষ্টি অনুসরণ করে শোভাযাত্রার দিকে একটা আগ্নেয় কটাক্ষ ক্ষেপণ করলে প্রতাপ দাস। বললে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ম্যাগাজিন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। অত সস্তা হবেনা।

—বোধ হয়।

তেমনি অন্যমনস্কভাবেই সঞ্জীব জবাব দিলে। সে ভাবছিল অন্যকথা। এখন পরিমল থাকলে বেশ হত। এই অবস্থায় নমিতার একখানা ফোটো পেলে যত্ন করে সে সাজিয়ে রাখত তার টেবিলে, হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের শেষ আলোর স্বাক্ষর তার জীবনের সব চাইতে বড় সম্পদ হয়ে থাকতে পারত।

কিন্তু আজ চব্বিশে আগষ্ট, উনিশ শো ছে'চল্লিশ। টেবিলের পাশে একটা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে সঞ্জীব। একটা সহজ ভদ্রতার কথা অবধি তার মুখে আসছে না।

তার সামনে মুখোমুখি বসেছেন সত্যশরণবাবু। বিনয়ে তাঁর মুখখানা কেমন অস্বাভাবিক আর কৌতুকজনক হয়ে উঠেছে। যেন সত্যশরণ চাটার্জি নয়—তাঁর ক্যারিকেচার। চোখে মুখে সেই তপস্যাক্লিষ্ট শুচিতা, সেই উন্নাসিক আভিজাত্য মুহূর্তে যেন ছায়া হয়ে

মিলিয়ে গিয়েছে। একটা তীব্র শারীরিক অস্বস্তি বোধ করছে সঞ্জীব, অস্থির চোখে লক্ষ্য করছে দেয়ালে টাঙানো দেশনেতাদের ছবিগুলোর দিকে।

সত্যশরণবাবু বলছিলেন, আপনি পাড়াতেই থাকেন, মুখ চেনা আছে, কখনো আলাপের সুযোগ হয়না। তাই আজ আপনাকে ডেকে নিয়ে এলাম। এখন তো আপনারাই ভরসা, যদি মুসলমানেরা অ্যাটাক-ফ্যাটাক করে—

শুকনো গলায় সঞ্জীব বললে, না, ভয় নেই।

—কিছু বলা যায়না মশাই, কিছু বলা যায়না। বিশ্বাস নেই ওদের। তা আপনি যদি মাঝে মাঝে একটু দয়া করে আসেন তাহলে আমরা খানিকটা আশ্বাস পাই আর কি!

তেমনি নিষ্প্রাণভাবে সঞ্জীব বললে, আসব।

চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল নমিতাই। সত্যশরণবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নমিতার দিকে একটিবার চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিলে সঞ্জীব। আশ্চর্য, এ তৃতীয় নমিতা। সত্যশরণবাবুর মতো এও নমিতার ক্যারিকেচার—এরও মুখে একটা বিচিত্র অস্বাভাবিকতা, একটা বিগলিত বিনয়ের ব্যঙ্গ। নমিতা কখনো এত কুৎসিৎ হতে পারে এটা স্বপ্নেরও অতীত ছিল সঞ্জীবের।

মধুর গলায় নমিতা বললে, চা নিন।

চা-টা যেন বিষের মতো তেতো মনে হল সঞ্জীবের। পথে যখন বেরিয়ে এল, তখন সমস্ত পৃথিবীটা তার কাছে যেমন শূন্য, তেমনি নিরর্থক হয়ে গেছে।

বন্দুক

অধৈর্যভাবে ঘরের ভেতরে পায়চারি করছে লোকনাথ সাহা। ক্ষুব্ধ আক্রোশে অনেকক্ষণ ধরে দাঁতের ওপর দাঁত চেপে রাখবার ফলে মাড়িটা টনটন করছে এখন। ডান হাতটা অতিরিক্ত জোরে মুঠো করে রাখবার জন্যে হাতের নরম মাংসের ভেতরে দু তিনটে নোখ্ একেবারে বসে গেছে, জ্বালা করছে চিনচিন করে—রক্ত পড়ছে বোধ হয়। কিন্তু লোকনাথ সাহা টের পাচ্ছে না কিছু—তেমনি অধৈর্য ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের মধ্যে পায়চারি করে যাচ্ছে।

তারপর আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনালো। ঘরের ভেতরে নামতে লাগল কালো অন্ধকার। যেগুলো স্পষ্ট আর আকারগত ছিল, ধীরে ধীরে তারা অবয়বহীন হয়ে যেতে লাগল। তারও পরে ঘরের ভেতরে লোকনাথ সাহার নিজের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু জেগে রইল না!

নিজের অস্তিত্বটাই শুধু জেগে রইল। কিন্তু অতি তীব্র, অতি ভয়ঙ্কর এই জাগরণ। ইচ্ছে করতে লাগল এই অন্ধকারের মধ্যেই সে ছুটে বেরিয়ে পড়ে, জ্বালিয়ে দেয় এই পৃথিবীটাকে—ভেঙে চুরমার করে দেয় যা কিছু সম্ভব। একটা অসহ্য অথচ অবাস্তব ধ্বংস-কল্পনায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো নিজের মধ্যে ধূমায়িত হতে লাগল লোকনাথ সাহা। যুগ পাল্‌টাচ্ছে—দেশ স্বাধীন হচ্ছে, সব মানি; এও জানি যে গরীবের দুঃখ দূর করতে হবে—চাষাভূষোদের পেটের অন্নের সংস্থান করে দিতে হবে। কিন্তু এ কী ব্যাপার! স্বাধীনতার আন্দোলন করতে হয়, লড়াই করতে হয়, করো ইংরেজের সঙ্গে। পেটের ভাত চাইতে হয়—মহকুমা হাকিমের বাংলোর সামনে গিয়ে ধর্ণা দাও—

শহরের রাস্তায় ভুখ মিছিল বার করো। এদের কোনোটাতেই লোকনাথ সাহার আপত্তি নেই। দরকার হলে দেশের জন্যে সেও আত্মবিসর্জন করতে পারে, অর্থাৎ একটা সভা-সমিতিতে সভাপতি হয়ে মাস তিনচার 'এ' ক্লাশ জেল খেটে আসতে পারে—যা সে এর আগেও করেছে ; আর বলো তো খবরের কাগজে জ্বালাময়ী একখানা পল্লীগ্রামের পত্রও সে লিখে দিতে পারে, অগ্নিময় কণ্ঠে প্রশ্ন করতে পারে : আমরা জানিতে চাই, জনপ্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলী এই অনাচার-অবিচারের প্রতিবিধান করিবেন কি না এবং কবে করিবেন ?

কিন্তু এ তো তা নয়। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে শেষ পর্যন্ত ফণা তুলে উঠেছে কেউটে সাপ। একি কখনো কল্পনাও করা যায় যে শেষ পর্যন্ত এ আপদ তারই ঘাড়ে চড়ে বসতে চাইবে ? তিন ভাগের দু ভাগ ধান ! তার মানে দু মাস পরে বলবে তিন ভাগের তিন ভাগই চাই ! আর শুধু ওই ধানেই থামলে হয় ! শেষ পর্যন্ত দাবি করে বসবে ঘর দাও, বাড়ি দাও, গোরু দাও—বউ দাও—

নাঃ—অসহ্য ! এবং, অসম্ভব। কচুগাছ কাটতে কাটতে ডাকাত হওয়ার যে অদূর সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়ে আসছে, এই মুহূর্তে তার কণ্ঠরোধ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে টুঁ শব্দটি করবার পর্যন্ত সাহস না পায়।

সত্যিই অসহ্য। লোকনাথ সাহা কান পেতে শুনতে লাগল গ্রামের দিক থেকে কোলাহল উঠেছে। জয়ের কোলাহল, আনন্দের কলধ্বনি। ফসল কেটে নিজেদের ঘরে তুলেছে ওরা—মহাজন আর জোতদারকে বলে পাঠিয়েছে, দরকার হলে তারা যেন নিজেদের ভাগ নিজেরা এসে নিয়ে যায়। ওরা জমিতে লাঙল দিয়েছে, সার দিয়েছে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, ফসল ফলিয়েছে এবং ফসল কেটেছে। আসলে সব ধানটাতেই ওদের দাবি। তবু জমিদার

জোতদারকে একেবারে বঞ্চিত করতে চায় না, তাই ধর্মের নামে তাদের একভাগ ধান দিতে ওদের আপত্তি নেই। তবে বাড়ি বয়ে সে একভাগ ওরা দিয়ে আসতে রাজি নয়—বাবুমশায় এবং মিঞা সাহেবেরা ইচ্ছে করলে নিজেরা এসে অথবা লোক পাঠিয়ে তাঁদের পাওনা ভাগ নিয়ে যেতে পারেন।

লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, নূর মামুদ আর বৃন্দাবন পাল চাষাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, আল্লার নামে, ভগবানের নামে ভেবে দেখ, তোরা কী করতে যাচ্ছিস।

চাষাদের পক্ষ থেকে রহমান জবাব দিয়েছিল, যা করেছি, আল্লার নামে ভেবেই করেছি। গায়ে-গতরে একটু আঁচড় লাগবেনা বাবু, জমির ভালোমন্দের দিকে একবার তাকাবেনা, অথচ থাবা দিয়ে অর্ধেক ধান গোলায় তুলে নেবে। নিজেরাই একবার ইমানের দিকে তাকিয়ে দেখ কোন্‌টা হক আর কোন্‌টা বেইমানি।

ফজল আলির আর সহ্য হয়নি। গর্জে বলেছিল, খুব তো হক আর বেইমানি বোঝাচ্ছিস! ওরে, মোছলমানের বাচ্চা হয়ে হিঁদুর ফাঁদে পা দিলি! লজ্জা হয়না?

রহমান শুধু হেসেছিল। বাধা দিয়ে বলেছিল, মোছলমান গরীব হিঁদু গরীবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পেটের ভাতের জন্যে লড়াই করলে গুণাহ্‌ হয় আর হিঁদু জোতদারের সঙ্গে দোস্তি করে মোছলমানের ভাত মারলে সেটাই বুঝি বড় ভালো কাজ হল? বোকা বুঝিয়োনা সাহেব, যাও, যাও—নিজের কাজে যাও—

—পিঁপড়ের পাখ্‌না গজিয়েছে মরবার জন্যে—অ্যাঁ?—ধৈর্যচ্যুত হয়েছিল ফজল আলী: আচ্ছা, টের পাবি! সেদিন পায়ে ধরে কাঁদলেও মাফ হবেনা—এই বলে রাখলাম।

—কলিজার রক্ত দিয়ে ধান রাখব, জান দিতে হয় দেব। তবু

তোমাদের দোরে হাত পেতে সিন্নি চাইতে যাবোনা। এও জানিয়ে রাখছি।

—বটে ? বেশ—বেশ।—আর কথা জোগায়নি ফজল আলীর। কয়েক মুহূর্ত নির্নিমেষ চোখে তাকিয়েছিল রহমানের দিকে—যেন রক্তখেকো একটা বাঘের মতো ওর ঘাড়ের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। তারপর দাঁতের ফাঁকে একটা ভয়ঙ্কর কটু শপথ উচ্চারণ করে ধীর-পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিল লোকনাথ সাহা, বৃন্দাবন পাল আর নূর মামুদ।

তারপর—

তারপর থেকে এই চলছে। মানুষগুলো ক্ষেপে উঠেছে, মেতে উঠেছে জয়ের আনন্দে। এ যেন সাপের পাঁচখানা পা দেখবার আনন্দ। কিন্তু সাপের যে সত্যি সত্যিই পাঁচটা পা বেরোয়না—এটা ওদের বোঝানো দরকার। বুদ্ধিটা শেষ পর্যন্ত বাতলে দিয়েছে ফজল আলীই। বলেছে, রঘুরামকে ডাকো।

—রঘুরাম ?

—হাঁ, রঘুরাম। সে ছাড়া আর কারো কর্ম নয়।

তারপর গলার স্বর নামিয়ে এনেছে ফজল আলী। চাপা গলায় বলেছে কতগুলো ভয়ঙ্কর কথা। শুনে লোকনাথের অবধি শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠেছে, হিম হয়ে গেছে হাতপাগুলো। জিভটা শুকিয়ে হঠাৎ যেন আঠার সঙ্গে আটকে গেছে তালুতে।

ক্ষীণকণ্ঠে লোকনাথ বলেছে, অতটা ?

—হ্যাঁ, অতটাই।

—বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না ?

—কিছু না। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

—কিন্তু থানা, পুলিশ—

ফজল আলী হেসেছে। বলেছে, সাধে কি তোমাদের সঙ্গে আমদের বনি-বনাও হয় না, না পাকিস্তান চাইতে হয়? আরে, অত ঘাবড়ালে চলে? তা ছাড়া থানা পুলিশ—গূঢ়ার্থব্যঞ্জক হাসিতে মুখখানাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে ফজল আলী: কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে পারলে ওরাও আপত্তি করবেনা দেখে নিয়ো। আর—একটু থেমে দু আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে বলে: ঠিক হয়ে যাবে।

—তাহলে রঘুরামকে খবর দিই?

—নিশ্চয়।

শুকনো ঠোঁটদুটোকে বার কয়েক লেহন করে দুর্বল অনিশ্চিত স্বরে লোকনাথ বললে, দেখো ভাই, শেষতক পেছনে পেছনে থেকো। শেষে আবার সামনে ঠেলে দিয়ে সরে পড়োনা।

—ক্ষেপেছ।—পিচ করে অবজ্ঞাভরে দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ছড়িয়েছে ফজল আলী: দুবার হজ করেছি, পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি আমি। জীবনে একটা রোজা আমার ভাঙেনি। খাঁটি মোছলমানের বাচ্চা আমি—ইমান নষ্ট করব! কী যে বলছ—তোবা তোবা!

সুতরাং ডাক পড়েছে রঘুরামের। রঘুরাম বলেছে সন্ধ্যের পরে আসবে, দিনের আলোয় এ ব্যাপার সম্ভব নয়। গাঁয়ের লোক এমনিতেই ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো ঘুরছে, দেখলেই সন্দেহ করবে। আর সন্দেহ করা মানেই চকচকে হাঁসুয়ার কোপে টুকরো টুকরো করে কেটে বস্তায় ভরে ভাসিয়ে দেবে করতোয়া নদীতে।

তাই সন্ধ্যার অন্ধকারে আসবে রঘুরাম। আসবে কালো রাত্রির আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে নিঃশব্দচর সরীসৃপের মতো। তারই জন্যে প্রতীক্ষা করছে লোকনাথ—পায়চারি করে বেড়াচ্ছে বন্য জন্তুর মতো—

চাষীদের কোলাহলের এক একটা দমকায় বুকের ভেতর এক একটা করে চিড় খেয়ে যাচ্ছে তার।

রঘুরাম আসবে। কিন্তু কখন?

রঘুরাম পাশী। তাল গাছ চাঁছে, তাড়ি তৈরি করে। ব্যবসা চলে অবশ্য আবগারিকে ফাঁকি দিয়ে। একবার ধরা পড়ে দুবছর জেল খেটেছে, কিন্তু স্বভাব বদলায়নি।

রোগা সিড়িঙ্গে লোকটা। নারকোলের দড়ির মতো ছিবড়ে পাকানো শরীর। অতিরিক্ত তাড়ি খায়, আবার গাঁজাও, টানে ততোধিক উৎসাহে, বলেঃ রসটা তো শুকোনো চাই—হে-হে-হে। চোখের রঙ্ ক্ষ্যাপা বুনো-মোষের মতো রক্তাভ, অত্যধিক নেশার ফলে স্বাভাবিক বর্ণ হারিয়ে ওই রঙ্টাই পাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু এইটুকুই যথেষ্ট পরিচয় নয় রঘুরামের। কোন্ ছেলেবেলাতে একটা গাদা বন্দুক জোগাড় করেছিল রঘুরাম, হাত পাকিয়েছিল। তার পর থেকে তার হাতের তাক একটা প্রবাদ-বাক্যের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। কার্তিক অঘ্রাণ মাসে আশ-পাশের বিলে হাঁস পড়তে শুরু হয়। মিঞা সাহেবেরা, বাবু মশায়েরা তখন বিলে নামে শিকারের চেষ্টায়। দমাদ্দম গুলি ছোঁড়ে—দশটা ফায়ারে একটা পাখী নামাতে পারে না। আর তাই দেখে এলোমেলো দাঁতগুলোর দুপাটি একেবারে পরিপূর্ণ করে মেলে দেয় রঘুরাম, হো-হো করে হাসে। বলে, কর্তাদের একটা গুলিও তো পাখিগুলোর গায়ে লাগবে না, তবে যে রকম শব্দ-সাড়া হচ্ছে তাতে দুটো চারটে বাসায় গিয়ে মরে থাকবে।

তা হাসতে পারে বইকি রঘুরাম, বিদ্রূপ করবার অধিকারও তার আছে। তার হাতের তাগ ফসকায় না। বাবুদের বন্দুক চেয়ে নিয়ে এক ফায়ারে দশটা পাখীও সে নামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, শুধু কি বত্রিশ ইঞ্চি বন্দুক আর বাক্সো বাক্সো টোটা থাকলেই শিকারী

হওয়া যায়? হাওয়া বুঝতে হয়, জায়গা বাছতে হয়, জল-কাদা কাঁটাবন ভাঙতে হয়। সুখের শরীর আর কোঁচানো ধুতিটি নিয়ে বন্দুক বাগিয়ে কাক তাড়ানো যায়, কিন্তু শিকার করা যায় না।

সত্যিই রঘুরাম পাকা শিকারী। আর শিকারী বলেই তাকে এমন সমাদর করে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তবে এবার আর তার পাখী শিকার নয়—তার চাইতে ঢের বড়, ঢের বিপজ্জনক শিকারের বন্দোবস্ত।

আর এদিক থেকেও বেশ নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট লোক রঘুরাম। নীতি বলে, বিবেক বলে কোনো কিছুর বালাই নেই তার। টাকা পেলে যা খুশি সে তাই করতে পারে, খামোকা গোটা তিনেক মানুষ খুন করে আনতে পারে। সকলের মাঝখানে থেকেও সে সকলের বাইরে—প্রয়োজনমতো নিজেকে কেন্দ্র করে সে একটা বৃত্তাকার পৃথিবী সৃষ্টি করে নিয়েছে। তালগাছ চাঁছে, তাড়ি গেলে, গাঁজা টানে, আর গ্রামের প্রান্তে যে ডোম পাড়া আছে সেখানে কোন্ একটা মেয়েমানুষকে নিয়ে সারারাত কাটিয়ে আসে। সুতরাং এ-কাজে তার চাইতে উপযুক্ত লোক আর নেই।

দরজায় ঘা পড়ল। ঘরের ভেতরে হঠাৎ ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়ে চমকে জেগে ওঠা মানুষের মতো বিকৃত স্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লোকনাথ: কে?

বাতাসের শব্দের সঙ্গে একাকার হয়ে স্বর ভেসে এল: রঘুরাম।

—দাঁড়াও, দোর খুলছি।

একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দরজাটা খুলে দিলে লোকনাথ। বিড়ালের মতো শব্দহীন পায়ে রঘুরাম ঘরে ঢুকল।

—দণ্ডবৎ কত্তা। কী জন্যে অধীনকে ডেকেছেন আজ্ঞে?

—বোসো বলছি।

দরজাটা আবার সাবধানে বন্ধ করে দিলে লোকনাথ। তারপর তেমনি ভাবেই ভয়ঙ্কর চাপা গলায়—যে গলায় ফজল আলী কথা বলেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই সেই কথাগুলোই সে আবৃত্তি করে গেল। চুপ করে শুনে গেল রঘুনাথ—শুনে গেল পাথুরে মূর্তির মতো।

—কখন ?

—কাল সন্ধ্যেয় ?

—কাল সন্ধ্যেয় ?

—হাঁ। দীঘির পাড়ে সভা করবে ওরা। বড় বাঁশ ঝাড়টার আড়াল থেকে কাজ শেষ করতে হবে।

—কটাকে মারতে হবে ?

—না, না, বেশি নয়। এক রহমান হলেই যথেষ্ট, ওটাকে ঘায়েল করতে পারলেই শিরদাঁড়া মট্‌কে যাবে ওদের। এবার তোমার হাতের তাক দেখব রঘুরাম।

রঘুরাম হাসল—এলোমেলো দাঁতগুলো বার করে বিশৃঙ্খল ভাবে টেনে টেনে হাসল খানিক্ষণ। বললে, আচ্ছা, বন্দুকটা দিন।

লোকনাথ বন্দুক বার করে আনলে। বললে খুব সাবধান। আমার প্রাণ হাতে দিয়ে দিচ্ছি তোমার, রঘুরাম। কাজ শেষ হলেই ফেরৎ চাই—নইলে মহা গণ্ডগোলে পড়ে যাবো।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, কাজ শেষ হলেই ফেরৎ দেব বই কি—তাজা কার্তুজগুলো আর খোলা বন্দুকটাকে একটা থলির ভেতরে পুরতে পুরতে রঘুরাম বললে, কিচ্ছু ভাববেন না—

তারপর উঠেই দ্রুতগতিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। লোকনাথ খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে—গ্রামের আনন্দ-কলরোল কানের পর্দায় এসে শঙ্কর মাছের চাবুকের মতো এক একটা করে প্রবল প্রচণ্ড আঘাত বসিয়ে যাচ্ছে তাকে।

কিন্তু একটা জিনিস জানলোনা লোকনাথ। সেই রাত্রেই রঘুরাম গেল ফজল আলীর বাড়িতে, তারপর বৃন্দাবন পালের আড়তে, তারপরে নূর মামুদের কাছারিতে। তারপর—

তার পরদিন বিকেলে জোর মিটিং বসেছে দীঘির পাড়ে। দলে দলে লোক জড়ো হয়েছে, চেঁচামেচি করছে, উচ্চারণ করছে তাদের কঠিন অপরাজেয় শপথ। উত্তেজনায় মুষ্টিবদ্ধ হাতটাকে বারে বারে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে রহমান : ভাই সব জান কবুল, আমরা ধান দেব না। আমরা না খেয়ে কুত্তার মতো মরব আর মহাজনের গোলা ভরে উঠবে আমাদের খুন-মাখানো ধানে, এ আমরা হতে দেবনা—কিছুতেই না—

গগনভেদী সমর্থনের রোলে হারিয়ে যাচ্ছে রহমানের কণ্ঠ। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে—সূর্যের উজ্জ্বল আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আজ আর রহমানের নিজের কথা কিছু বলবার নেই। তার কথা আর সমস্ত মানুষের কথার বন্যায় একাকার হয়ে গেছে, সমস্ত মানুষের প্রতিশোধ আর প্রতিরোধের উদ্ধত মুষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে রহমানের উদ্যত মুষ্টিও। ব্যক্তি-মানুষের সীমানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সমষ্টিময় মানুষের বিপুল বিস্তারে, আজ শুধু রহমান বক্তা নয়—সমস্ত মানুষের বক্তব্য এক সুরে মুখর হয়ে উঠেছে : জান দেব, ধান দেব না—

নতুন জীবনবোধ, নতুন শপথ।

পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে, মাথার ওপরে কাঁপছে আকাশ। আকাশে বাতাসে ঝড় ভূমিকম্পের সংকেত—বজ্র-বিদ্যুতের আগ্নেয় সূচনা। অসম্ভব—এ সহ্য করা যায় না। বিকেলের ছায়া নিবিড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, অন্ধকার আসছে। আর সেই

অন্ধকারের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, বৃন্দাবন পাল, আর নূর মামুদ।

রঘুরামের হাতের তাক কখনো ভুল হয় না!

বিকেল কেটে গেল, সন্ধ্যা নামল। দীঘির পাড়ে এখনো মিটিং চলছে। মশালের আলো জ্বলছে, রহমান, কান্তলাল, যদু প্রামাণিক, মইনুদ্দিন—বলে যাচ্ছে একের পর একজন। একই কথা—পুরোনো কথা। জান দেব, ধান দেব না—

কিন্তু কোথায় রঘুরাম—রঘুনাথের মতোই অব্যর্থ সন্ধানী রঘুরাম? তার হাতের তাক কখনো ব্যর্থ হবে না। বাঁশের ঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে মাত্র একটা গুলি ছুঁড়বে সে—বুকে হাত চেপে পড়ে যাবে রহমান। একটি ঘায়েই বিষদাঁত উপড়ে যাবে কাল-কেউটের। কিন্তু সে কখন—কোন্ শুভলগ্নে?

লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, বৃন্দাবন পাল আর নূর মামুদ অধৈর্য হয়ে উঠছে। আর কত দেরি করবে রঘুরাম? সময় চলে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে অতি মূল্যবান অতি দুর্লভ সুযোগ। সভা ভেঙে গেলেই রহমানকে আর সহজে পাওয়া যাবে ন, কোথা থেকে কোথায় যে ঘুরে বেড়ায় লোকটা তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই। আজ হয়তো এখানেই .আছে, দেখতে দেখতে কাল সকালে একেবারে হাওয়া হয়ে যাবে, চলে যাবে দূরে—অন্যান্য গ্রামে গিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করবে। লোকটা এ গাঁয়েরও নয়, কোথা থেকে যে শনির মতো আমদানি হয়েছে ভগবানই জানেন। চাল নেই, চুলো নেই, গাঁয়ে গাঁয়ে চাষা প্রজা ক্ষ্যাপানো ছাড়া আর কোনো কাজই নেই তার।

কিন্তু এত দেরি করছে কেন রঘুরাম, কেন এমনভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে এই দুর্মূল্য মহার্ঘ্য সময়? একটা বন্দুকের শব্দ শোনা দরকার,

শোনা দরকার সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে এই :আন্দোলনটার মৃত্যু যন্ত্রনার মতো একটা ভয়াবহ আর্তনাদ। একটা অস্বস্তিকর অধৈর্য পাথরের মতো গুরুভার হয়ে চেপে বসছে লোকনাথ সাহা, নূর মামুদ, ফজল আলী আর বৃন্দাবন পালের বুকের ওপর। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে নিজেদের হাতগুলো কামড়ে রক্তাক্ত করে দিতে। কেন দেরি করছে—কেন এমন অশুভভাবে বিলম্ব করছে রঘুরাম!

অবশেষে পরমাশ্চর্য যা, তাই ঘটল। মিটিং শেষ হয়ে গেল—নিরাপদে, একান্ত নির্বিবাদে। কাল্‌-কেউটের বিষদাঁত ভাঙল না—বরং আরো বেশি বিষ-সঞ্চয় করে নিলে সে—আরো বেশি করে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল আকাশে বাতাসে ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্পের সংকেতময়তা।

—কী হল রঘুরামের ?

ছুটতে ছুটতে এল ফজল আলী, নূর মামুদ, বৃন্দাবন পাল।

—কী হল রঘুরামের ?

—তাইতো ব্যাটা করলে কী শেষ পর্যন্ত ?

সভয়ে লোকনাথ বললে, কাল সন্ধ্যেবেলায় ব্যাটা আমার বন্দুকটা নিয়ে গেল—

—অ্যাঁ!—তিনজনেই চমকে উঠল।

ফজল আলী বললে, সে কি! তোমার বন্দুক নিয়েছে! আমার কাছ থেকেও তো বন্দুক চেয়ে নিয়ে গেল, বললে, তোমার বন্দুকটা নাকি খারাপ হয়ে গেছে তাই—

নূর মামুদ আর বৃন্দাবন পাল আর্তনাদ করে উঠল : কী সর্বনাশ, ওই একই কথা বলে ব্যাটা তো আমাদেরও বন্দুক চেয়ে নিয়ে এসেছে—

ঘরের ভেতরে যেন বাজ পড়ল।

কারও মুখ দিয়ে আর একটিও কথা ফুটছে না। একটা নয়, দুটো নয়, চার-চারটে বন্দুক সংগ্রহ করেছে, রঘুরাম। কিন্তু কেন? একটা একগুলির শিকারের জন্যে সে চারটে বন্দুক নিয়ে কী করবে?

হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত রঘুরামকে পাওয়া গেল চাঁড়াল পাড়াতে।

গাঁজা আর তাড়ির নেশায় তার তখন তুরীয় অবস্থা। একদল চাঁড়াল মেয়ে পুরুষের একটা উন্মত্ত অশোভন বৈঠকে বসে সে প্রাণ খুলে অশ্লীল গান ধরেছে।

ফজল আলী চিৎকার করে উঠল: এই হারামীর বাচ্চা, আমাদের বন্দুক কই?

নেশারক্ত চোখ দুটো মেলে তাকালো রঘুরাম। তারপর এলো-মেলো বিশৃঙ্খল দাঁতগুলো বার করে পরম কৌতুকে হো হো করে হাসতে শুরু করে দিলে।

—হাস্‌ছিস্ যে শালা? বন্দুক কোথায়?

একমুহূর্তের জন্যে হাসি বন্ধ করে রঘুরাম বললে, রহমানকে দিয়েছি।

—রহমানকে !!!

আকাশ বিদীর্ণ করে বাজ পড়ল না, আকাশটাই যেন ধ্বসে পড়ল মাটিতে। এক মুহূর্তে থ্যাতলা হয়ে, চ্যাপটা হয়ে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে গেল লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, বৃন্দাবন পাল, আর নূর মামুদ।

—রহমানকে !!!

—তা ছাড়া আবার কী?—এবার রঘুরাম আর হাসল না। পাকা ব্যবসায়ীর মতো গম্ভীর বুদ্ধিমানের গলায় জবাব দিলে: ওরা বেশি ধান পেলে আমার তাড়িও বেশি বিক্রী হবে এটা কেন বুঝতে পারছ না?

শিল্পী

কোনারকের ডাকবাংলোর পেছনের বারান্দায় আমরা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিলুম। বিকেলের প্রসন্নতা নেমেছে পৃথিবীতে, ঘন ঝাউ-বনের নীচে ঝিলমিলি রোদের সঙ্গে শান্ত একটা ছায়া থর থর করে কাঁপছে। নানারকমের পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে, একটা বেঁটে কিং কোকোনাটের নীচে এক জোড়া মুনিয়া, তাদের একটি অপর-টিকে ঘিরে ঘিরে একটা বিচিত্র নাচের মহড়া দিচ্ছে। বৈজ্ঞানিকের মতে নারীর হৃদয় জয় করবার জন্যে পুরুষের চিরন্তন তপস্যা।

ডাক বাংলোর বুড়ো খানসামা অর্জুন চা দিয়ে গেল। অন্যমনস্ক-ভাবে আমরা চা খেয়ে চললাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই। হাজার বছরের নিস্তব্ধ গম্ভীর অতিকায় সূর্যরথের নিঃশব্দ শাসন যেন আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নিজের ভেতরে এমনি একটা স্তম্ভিত সমাহিতি আমি অনুভব করেছিলুম নালান্দায় গিয়ে,—মনে হয়েছিল আমার চারদিকে একটা অস্পষ্ট দূরাগত মন্ত্রোচ্চার ধ্বনিত হচ্ছে—একটা কথা বললেই যেন কাদের উপাসনায় বিঘ্ন ঘটে যাবে। কোনারকের সূর্যমন্দির দেখেও নিজেকে ক্রমাগত বলতে ইচ্ছে করছিল: কালের রথ যেখানে শব্দহীন, সময়হীন অতীতের মধ্যে থেমে দাঁড়িয়েছে, সেখানে হে আধুনিক কালের প্রগল্ভ, তোমার রসনাকে সংযত করো এবং এই পাষাণের মহাকাব্যকে প্রণাম জানিয়ে নিঃশব্দে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

কিন্তু চা-টা শেষ করে আমি সজাগ হয়ে উঠলুম। অর্জুনের তৈরী গুড়ের কড়া চার মহিমা আছে, এক মুহূর্তে কল্পনার ভূতটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলে। এত বিশ্রী বিস্বাদ চা জীবনে কোনোদিন খাইনি।

আমি বললুম, সবাই এমন ধ্যানস্থ কেন? একটা সিগারেট কেউ দাও। কথাটার প্রয়োজন ছিল। সকলেই নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসল, যেন প্রত্যেকের মুখেই প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধের ছায়া পড়েছে একটা। বেশ শব্দ করেই বিশ্বনাথ সিগারেটের টিনটা আমার দিকে সরিয়ে দিলে, যেন এতক্ষণের নীরবতার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

অ্যাড্‌ভোকেট চণ্ডীবাবু রূপোর কৌটো খুলে একটা পান মুখে পুরলেন। বললেন, উঃ, কী চা-ই তৈরী করেছে। এর চাইতে খানিকটা গরম জল গিলে ফেলাও ভালো ছিল।

গোবিন্দ কেমেষ্ট্রির ছাত্র। সে মন্তব্য করলে, সিক্সটি পার্সেণ্ট চিরতা আর ফরটি পার্সেণ্ট চিটেগুড়ের কম্বিনেশান।

শুধু কথা বলল না অনু। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ওর চোখ থেকে তখনো ঘোর কাটেনি। অনেক দূরে—রাশি রাশি বালিয়াড়ি পার হয়ে বিস্তীর্ণ বালির ডাঙা ছাড়িয়ে যেখানে সমুদ্রের নীলিম আভাস, সেদিকে ও স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তখনো, আর শাড়ীর জরি পাড়টা হাতের আঙুলে জড়াচ্ছিল ক্রমাগত।

হঠাৎ অনু প্রশ্ন করে বসল, তারা গেল কোথায়?

আমি সবিস্ময়ে বললুম, কারা?

—যারা পাথরের গায়ে এমন আশ্চর্য ছন্দ ফুটিয়ে তুলেছিল? সে মানুষগুলো কি একেবারেই ফুরিয়ে গেছে?

চণ্ডীবাবু তাচ্ছিল্যভরা গলায় বললেন, তারা আর বেঁচে নেই। যারা রয়েছে তারা নিতান্তই উড়িয়া, তাদের প্রতিভার বিকাশ দেখা যাচ্ছে পাণ্ডাগিরির গুণ্ডামিতে—পুরী আর ভুবনেশ্বরে অভদ্র অত্যাচারে।

উড়িষ্যার প্রবাসী বাঙালী বিশ্বনাথ এবার ধীরে ধীরে মাথা

নাড়ল। বললে, না, ভুল করছেন। পুরী আর ভুবনেশ্বর দেখে উড়িষ্যাকে চিনতে পারবেন না। শিল্পীর দেশ উড়িষ্যা আজো বেঁচে আছে, বেঁচে আছে ঝাউবন আর কেয়ার কুঞ্জে ঘেরা ছোট ছোট গ্রামে,—মরা মহানদী, লোনা নদী চন্দ্রভাগার তীরে তীরে। বিশ্বনাথের বলার ভঙ্গিটা রোমান্টিক্ হয়ে উঠতে লাগল : তাদের দেখতে জানা চাই, চিনতে পারা চাই। আর এখনো সময় আছে, বেশি দেরী করলে সত্যিই সে মানুষগুলো আমাদের চোখের আড়ালে চিরদিনের মতো মুছে যাবে।

দূরের সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি রেখে অনু বললে, সত্যি ?

—সত্যি।—এক টিপ নস্যি নিয়ে বিশ্বনাথ বললে, তা হলে একটা গল্প বলি, শুনুন।

এককালে উড়িষ্যার মতো শিল্পপ্রাণ দেশ পূর্বভারতে যে আর ছিল না এ তো ইতিহাসের কথা। উড়িষ্যার অসংখ্য মন্দিরে, বিশেষ করে কোনারকের চারুকলায় তার প্রমাণ রয়েছে। ও নিয়ে আমি বেশি বিদ্যে ফলাবনা, আমার চাইতে বড় বড় পণ্ডিত লোক তোমরা এখানে রয়েছ।

কিন্তু একটা জিনিস আমার নিজের চোখেই পড়েছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের আঘাত বারবার উড়িষ্যার বুকে এসে লেগেছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, অবৌদ্ধ—কারো আক্রমণ থেকেই কলিঙ্গ নিস্তার পায়নি। অশোকের অনুতপ্ত জীবন-কাহিনীতেই সেই ভয়াবহ রক্তপাতের খানিকটা আভাস পেতে পারি আমরা।

তবু আশ্চর্য এই দেশটার শিল্পপ্রীতি। এত রক্ত, এত দুর্যোগের মধ্যেও কলিঙ্গ তার ঐতিহ্য হারায়নি। বহুযুগের এপারে এসেও তার শিল্পীরা এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি তৈরী করেছে, এক ফালি কাঠের ওপরে ফুটিয়েছে অপরূপ কারুকার্য,

তুলির টানে টানে নির্ভুল ছন্দে যতিতে রচনা করেছে রঙ আর রেখার কবিতা। স্তম্ভকা লিপির রূপদক্ষ দেবদত্তের দল বাংলা দেশ থেকে বহুকাল আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু যে ভাস্করেরা তাদের স্বাক্ষর রেখেছিল, এই কোনারকের মন্দিরে, খণ্ডগিরি উদয়গিরিতে, তাদের বংশধরেরা অত সহজেই কিন্তু অতীতকে বিসর্জন দেয়নি।

বাংলার পটশিল্প নিয়ে তোমরা গর্ব করো। সেটা ভালো জিনিস, সন্দেহ নেই। কিন্তু উড়িষ্যার লোককলা যদি কোনদিন আলোচনা করবার সুযোগ পাও তা হলে দেখবে এদের .সম্পদ কত সহস্রগুণে বেশি। এখনো এদেশে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কাঠের একরকম পানপাত্র দেবার রেওয়াজ আছে। এগুলো দেখলে বুঝতে পারবে সূক্ষ্ম চারুকলায় আজ পর্যন্ত এদের কী অসাধারণ অশিক্ষিত পটুত্ব। এদের মেটে দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলোকে লক্ষ্য কোরো, একটু মন দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে সহজ শিল্পবোধ কেমন করে এদের রক্ত-মাংস, অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে আছে। কিন্তু এতদিনে এ শেষ হয়ে এল। দুর্ভিক্ষ আর মড়কের দেশ উড়িষ্যায় এ শিল্পীরা আর বেশিদিন বাঁচবে না। এখানে হাইকোর্ট হবে, ইউনিভার্সিটি হবে, এখানকার সী বিচ্ আলোড়িত করে তুলবে আধুনিক কালের সাজসরঞ্জাম, শুনতে পাচ্ছি আর্টিফিশিয়্যাল পোর্ট পসিবিলিটিও নাকি আছে। সবই হবে— কলকাতা বোম্বাইয়ের সঙ্গে পুরী-কটক-ভুবনেশ্বরের কোনো পার্থক্যই থাকবেনা; কিন্তু মরে যাবে সত্যিকারের উড়িষ্যা, হাজার বছরের প্রাণ তার সকলের চোখের আড়ালে নিঃশব্দে শুকিয়ে মরে যাবে। তাকে কেউ বাঁচিয়ে তুলবেনা, তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব কারো নেই।

কিন্তু আমি বোধ হয় বেশি ভূমিকা করে ফেলছি। কাহিনীটাই বলি।

এই শিল্পীদের একজনকে আমি ছেলেবেলায় জানতুম—তার নাম সনাতন।

কী কারণে ঠিক মনে নেই, প্রায় তিন বছর পুরীর বাড়িটা ভাড়া দিয়ে বাবা উড়িষ্যার এক গ্রামে বাস করেছিলেন। সে গ্রামের নাম আমার মনে নেই—মনে থাকবার কথাও নয়। শুধু মনে আছে অফুরন্ত কেয়াবনের কথা। বর্ষার জল পড়লে অজস্র কেয়া ফুটত, তার তীব্র মধুর গন্ধে নেশা ধরে যেত, চোখে ঘুম আসত জড়িয়ে। একটি পদ্মদীঘি ছিল—শ্বেত পদ্মে আর রাশি রাশি ঘন সবুজ পাতায় তার জল দেখতে পাওয়া যেতনা। আর মনে আছে চন্দ্রভাগাকে—জোয়ারে ফুসে উঠত, দুলে উঠত, আবার ভাটার টান পড়লে শান্ত স্নিগ্ধতার মধ্যে ঝিমিয়ে পড়ত।

এই গ্রামেই থাকত সনাতন।

কী জাত ছিল বলতে পারব না; গলায় পৈতেটা কখনো দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারিনা। তবে মাথার চারদিকটা বেশ করে কামিয়ে ব্রহ্মতালুর ওপরে মস্ত বড় একটা ঝুঁটি বাঁধত—যা এখনো কোনো কোনো উড়িয়ার দেখতে পাওয়া যায়। এমনিতে একান্ত শান্তশিষ্ট ছিল মানুষটি, কিন্তু হিন্দুস্থানীর চৈতনের মতো ওই ঝুঁটি সম্পর্কে ভারী দুর্বলতা ছিল তার। আর এই কারণেই ওই ঝুঁটিটা নেড়ে চেড়ে দেবার জন্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা বোধ করতাম আমি। কিন্তু আমার সম্পর্কে একধরণের স্নেহ ছিল সনাতনের—মনে মনে খুশি না হলেও ঝুঁটির ওপরে ওসব হাঙ্গামা সে প্রসন্নমুখেই সহ্য করে যেতো।

সে ছবি আঁকত, আঁকত প্রাণ দিয়ে। আর কোনো কাজ ছিল না তার, কোনো আকর্ষণ ছিল না। দিনরাত শিল-পাটায় রং ঘষা চলত, তুলি ঠিক করা হত—আর ছবি আঁকা; সমস্ত দিন এই পর্ব

চলত তাই নয়—প্রহরের পর প্রহর বিনিদ্র রাত জেগে রেড়ীর তেলের আলোয় ছবি আঁকতে দেখেছি তাকে। চোখের কোনে কালী পড়েছে, সমস্ত মুখে ক্লান্তি আর জাগরণের অবসন্ন ছায়াভাস; তবু দেখতাম কী একটা আশ্চর্য আনন্দে আর উৎসাহে তার চোখদুটো আগুনের মতো দপদপ করে জ্বলছে।

কিন্তু শুধু ছবি আঁকলেই তো সংসার চলে না। কিছু ক্ষেতি জমি আছে—তা দেখাশোনা করতে হয়, বুনতে হয় ধান কলাই। দশটা কাজকর্ম না করলেও উপায় নেই। সুতরাং সনাতনের বাপ চটে আগুন হয়ে গেল।

তারপরে একদিন প্রচণ্ড ঝগড়া।

বাপ বুড়ো হয়েছে—একমাত্র ছেলেই তার ভরসা। কাজেই তার দোষ ছিল বলা যাবে না। প্রাণপণে চীৎকার করে সে বলতে লাগল, দুদিন পরে আমি মরে গেলে তোর অবস্থা কী হবে?

সনাতন সংক্ষেপে বললে, ছবি আঁকব।

—ছবি আঁকবি?—বিশ্রী মুখভঙ্গি করে একটা অশ্লীল গাল দিলে বাপ: ছবি আঁকলেই তো আর পেটে পিণ্ড 'পড়িবো না শড়ার ব্যাটা শড়া!'

সনাতন জবাব দিলেনা, চুপ করে শুনে যেতে লাগল।

বাপের মেজাজ আরো চড়ে উঠল: সংসারের কাজই যদি না করবে তা হলে এমন ছেলে থাকলে লাভ কী?

ছেলে জবাব দিলে, কিছুই না।

বাপ বললে, সে ছেলের মরে যাওয়াই উচিত।

এবার সনাতন চটে গেল, তুমিই মরো, আমি নিশ্চিন্তে ছবি আঁকতে পারব।

মরতে বললে বুড়ো মানুষ সব চাইতে বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

মৃত্যুর ছায়াটা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ আর প্রত্যাসন্ন থাকে বলেই মৃত্যুর কথাটা ভুলে যেতে চায় সে। রাগে সনাতনের বাপের চোখমুখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল, তার অশ্রাব্য গালিগালাজে কান পাতবার জো রইল না।

বাপ বললে, অর্থাৎ যা বললে তার সারাংশ: 'তোকো যমো নিব, তোকো শিয়ালো খিব, তোরো মুখে 'কীটো পড়িব।' আমার বাড়িতে আর তোর জায়গা নেই—তুই যেখানে খুশি চলে যা।

পরদিনই সনাতন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

তার পরের কাহিনীটা অত্যন্ত করুণ। রাগের মাথায় যাই বলুক, পাগলের মতো কান্নাকাটি স্বরু করে দিলে সনাতনের বাপ। পাগলের মতো বললে ঠিক হয় না, সত্যি সত্যিই যেন পাগল হয়ে গেল লোকটা। দিনরাত বসে বসে কপাল চাপড়াত, কাঁদতে কাঁদতে দুচোখে পিঁচুটি পড়ে গিয়েছিল তার। স্নান করত না, খেতনা, তার দিকে তাকালে ভয় করত।

মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে কান্না শুনেছি তার। সে কান্না মানুষের নয়। একটা জানোয়ারের মুখ চেপে ধরলে বোবা গোঙানির মতো যে রকম অস্বাভাবিক শব্দ হয়, ঠিক তেমনি আর্তনাদ করে কাঁদত সনাতনের বাপ। সে কান্না শুনে আমরা বিছানার ওপরে আঁতকে উঠে বসতাম, সে কান্নায় আমাদের গায়ের রক্ত একটা বিচিত্র আর আকস্মিক ভয়ে যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইত।

তিন মাস পরে সনাতনের বাপ মারা গেল। খবর পেয়ে আমরা তাকে দেখতে গেলাম সকাল বেলায়। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে, কলকাতার দাঙ্গায় মৃত্যুর অনেক রূপ চোখে পড়েছে, কিন্তু সেদিনকার সে দৃশ্যের কথা আমি ভুলতে পারব না। একটা নোংরা মেজের ওপরে উবুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা, ঘাড়টা একদিকে ফেরানো—যেন কোনো

অশরীরী প্রেতাত্মা সেটাকে মটকে দিয়েছে। মুখের পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে কালো হয়ে আছে, আর অজস্র লাল পিঁপড়ে এসে চোখমুখ আক্রমণ করেছে তার। সমস্ত ঘরে একটা চাপা অস্বস্তিকর গন্ধ—মৃত্যুর গন্ধ।

এই বিশ্রী বীভৎস মৃত্যুর একটা করুণ দিকও ছিল—সেটা সেই ছেলেবেলাতেও আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। সনাতনের বাপ বুকের নীচে প্রাণপণে আঁকড়ে রেখেছিল একরাশ ছেঁড়া পট, সনাতনের আঁকা ছবি। মরবার আগে সে ছেলেকে ক্ষমা করে গিয়েছিল।

আরো কিছুদিন পরে ফিরল সনাতন। তখন বাড়ির ভিটেটা ভেঙে নেমেছে, গলে পচে ঝরে গিয়েছে চালের খড়, সমস্ত উঠোনময় গজিয়েছে আকন্দের জঙ্গল। অভিভূত বিহ্বল ভাবে খানিকক্ষণ সেই ভাঙা দাওয়ার ওপরে বসে রইল সনাতন। তারপর মিনিট দশেক খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে জঙ্গল সাফ করতে লেগে গেল। শিল্পী মানুষ—শোকটাকে বেশিক্ষণ আগলে রেখে রোমন্থন করা তার স্বভাব নয়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। সনাতন খানিকটা গৃহী হয়েছে। জমিতে লাঙল দেয়, চাষ আবাদ করে। ছবি আঁকা অবশ্য বন্ধ হয়নি, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদটাকেও তো অস্বীকার করবার জো ছিল না। বাপ যতদিন ছিল, ততদিন সামনে ছিল পাহাড়ের আড়াল; সে আড়ালটা সরে যেতেই পৃথিবীর দাবী দুহাত মেলে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

ফাঁকা ঘরে আর মন টিঁকছিল না বলে, এবারে সনাতন বিয়ে করল। বৌ ঘরে এল—নাকে প্রকাণ্ড চাকার মতো নথ-পরা চিরন্তন উড়িয়া মেয়ে। ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝগড়া, ঝাঁটা আর গৃহকর্ম শুরু করে দিলে আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে।

শিল্পী সনাতন, ভাস্কর সনাতন ওই কলহকুশলা মেয়েটিকে বিয়ে করে কতখানি সুখী হয়েছিল বলা মুশ্‌কিল। কিন্তু মনে হয় তার বিয়ে করবার কারণটা এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি। সংসারের পক্ষে একান্ত অপটু সনাতন বুঝতে পেরেছিল নিজের বোঝা নিজে টেনে চলবার মতো সামর্থ্য তার নেই। বাপের শূন্য জায়গা স্ত্রীকে দিয়ে চেয়েছিল পূরণ করতে, ভেবেছিল এবার অন্তত এমন একজন এল যে তাকে বুঝতে পারবে, সংসারের বাজে ঝামেলাগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে অস্বস্তিকর দৈনন্দিতার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবে তাকে।

কিন্তু ভুল করেছিল সনাতন। সে জানত না, বাপের চাইতে স্ত্রীর দাবী বেশি; স্ত্রী তাকে আশ্রয় দিতে চায়না, আশ্রয় চায় তারি কাছে। স্নেহ-প্রেমের ব্যাপারটাকে স্ত্রী সংসারের মূল্যে বাজিয়ে নিতে চায়, যাচাই করে নিতে চায় জীবনের প্রয়োজন দিয়ে।

সুতরাং সংঘর্ষ বাধল।

স্ত্রীকেও অবশ্য দোষ দেওয়া চলেনা। তুমি কি আশা করতে পারো, ঘরের বৌ তোমার বলদ তাড়াবে, তোমার ছাগল অন্যের ফসল খেয়ে খোঁয়াড়ে গেলে তাকে ছাড়িয়ে আনবে, তোমার জমিতে লাঙল ঠেলবে, তোমার দাওয়ার খুঁটি কাটবে আর চালে উঠে ঘরে ছাউনি দেবে? জাঁতা ঘোরাতে সে রাজী আছে, উদুখল পাড়তে তার আপত্তি নেই, দাওয়া নিকিয়ে দেবে, ধান রুয়ে দেবে, জাবনা কাটবে, দুবেলা তোমার কানায়েও ঠেলবে। তার নির্ধারিত সীমানার ভেতরে সব কাজ করতেই সে রাজী আছে, কিন্তু একা হাতে পুরুষের সমস্ত কাজগুলো করাও কি তার পক্ষে সম্ভবপর? তুমি যদি দিনরাত মনের আনন্দে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও আর বসে বসে শুধু কাগজ নিয়ে ছাইপাশ আঁকিবুকি করো, তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানানোর আইনসঙ্গত অধিকার তার নিশ্চয় আছে।

দিন কয়েক স্ত্রী গুঞ্জন করে অসন্তোষ প্রকাশ করলে, তার পরে নিজমূর্তি ধরলে রক্ষাচণ্ডীর মতো। রূপোর গোটপরা কোমরে হাত দিয়ে বাঁকা হয়ে সে ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়িয়ে গেল। বাঁশি বাজাবার জন্যে নয়—ঝগড়া করার সুমহান অনুপ্রেরণায়।

ক্ষুরধার রসনা। তিনটে ফাটা কাঁসর এক সঙ্গে বাজাবার মতো আওয়াজ। কত ছোট যন্ত্র থেকে কত ভয়ঙ্কর আওয়াজ বেরুতে পারে তা দেখলে পানের দোকানের অসহ্য রেডিয়োগুলো পর্যন্ত লজ্জা পাবে।

দিন কয়েক সনাতন কানে হাত দিয়ে রইল। কিন্তু যে আওয়াজ চীনের প্রাচীর ভেদ করতে পারে, সাধ্য কি তাকে ঠেকিয়ে রাখা। রাইফেলের গুলির মতো কর্ণপটহ বিদীর্ণ করে তা সনাতনের মরমে গিয়ে প্রবেশ করতে লাগল। ঘরের দাওয়া ছেড়ে স্ত্রী মাঠে এসে নেমে দাঁড়ালো; বক্তব্যটা শুধু সনাতনকে জানিয়ে তার তৃপ্তি নেই—পৃথিবীতে যত চক্ষুষ্মান্ এবং বিবেকবান লোক আছে সকলের কাছেই সে তার নারীত্বের দাবীটা ঘোষণা করতে চায়।

সনাতন শিল্পী বটে, কিন্তু নারীত্বের মর্যাদা সম্পর্কে সে তত্টা ওয়াকিবহাল ছিলনা। তা ছাড়া তার ধৈর্য অসীম থাকার কথাও নয়। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী যখন একদিন রঙের বাটিটা তার ছবির ওপরে উবুড় করে দিলে, তখন শিল্পীর হৃদয়ে চিরন্তন পুরুষ জেগে উঠল।

খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ভয়ঙ্কর একটা গর্জন ছেড়ে স্ত্রীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লে সনাতন। একটা হ্যাঁচ্কা টানে ছিঁড়ে নিলে জটপাকানো একরাশ চুল, কিল, চড় আর লাথি চালাতে লাগল প্রাণপণে। স্ত্রীও একেবারে অহিংস ছিলনা, সুতরাং পালাটা জমল ভালো।

সময়মতো পাড়ার লোক পৌঁছে না গেলে সে যাত্রা সনাতন স্ত্রীকে খুনই করে বসত বোধ হয়। দুজনকে যখন ছাড়িয়ে দেওয়া হল, তখন স্ত্রীর উলঙ্গিনী কালীমূর্তি, গলায় পাঁচ পাঁচটা আঙুলের দাগ। সনাতনের অবস্থাও খুব সুখের নয়—ধারালো নখের আঁচড়ে গাল মুখের এক পর্দা চামড়া উড়ে গিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। অবরুদ্ধ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে পরস্পর পরস্পরকে গাল দিচ্ছে পৃথিবীর অশ্রাব্যতম এবং কটুতম ভাষাতে।

পাড়ার লোকে বললে, ছিঃ ছিঃ!

বুনো মোষের মত গোঁ গোঁ করতে করতে সনাতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

দিনকয়েক সব চুপচাপ। বোধহয় লজ্জিত হয়েছিল সনাতন—এবার সে আদর্শ স্বামীর মতোই সংসারধর্মে মন দিলে। স্ত্রীর রসনাও একটু ক্ষান্ত হল, বোধ করি বুঝতে পেরেছিল শান্তশিষ্ট ভোলানাথ মানুষকে ক্ষেপিয়ে দিলে সে কালভৈরবের মূর্তি গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু সন্ধি আর শান্তি এক নয়। সনাতনের রক্তের ভেতরে কোণারকের শিল্পীদের যুগার্জিত সংস্কার; তার ছবি আঁকার নেশা মদের চাইতেও উগ্র, রেস খেলার চাইতেও সর্বগ্রাসী। ফলে আবার খিটিমিটি সুরু হয়ে গেল এবং পুরাতনের পুনরাবৃত্তি।

এবার স্ত্রীকে পাওয়া গেল অজ্ঞান অবস্থায়। তার মাথায় এক ঘা ডাণ্ডা বসিয়েছে সনাতন—রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। আজ নিজের কীর্তির দিকে তাকিয়ে সতাতন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সনাতনের শ্বশুর অবস্থাপন্ন লোক। চারখানা গোরুর গাড়ি তার ভাড়া খাটে, তার বাড়ির দাওয়ায় পাঠশালা বসে। খবর পেয়ে সে ক্ষেপে গেল। মেয়েকে নিয়ে তো গেলই, থানাতেও এজাহার করে দিলে।

এল পুলিশ। কোমরে দড়ি বেঁধে সনাতনকে হাজতে নিয়ে গেল। বললে শড়া খুনী!

খুনী! কথাটা সনাতনের নিশ্চয় বুকে বিঁধেছিল বাজের মতো। সে ছবি আঁকে, সৌন্দর্যের সাধনা ছাড়া তার জীবনে বড় সত্য আর কিছু নেই। সে খুনী।

থানায় যাওয়ার সময় আমরা দেখলুম সনাতনের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। আশ্চর্য রক্তহীন আর বিবর্ণ তার মুখ। মনে হল সনাতন আর বেঁচে নেই—একটা শবদেহকে কোমরে দড়ি বেঁধে ওরা টেনে নিয়ে চলেছে।

বাস্তবিক, শিল্পী সনাতনের মৃত্যু হল। সে আর বাঁচল না।

হাজার হোক, শ্বশুর। জামাইকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও জেল খাটাতে চায়নি। কাজেই দিনকয়েক বাদে সে আবার ফিরে এল।

এবার একা—একেবারে একা। স্ত্রীর সঙ্গে যতই বিরোধ আর বিবাদ থাক—সংসারে একটা নতুন আস্বাদ যে সে পেয়েছিল কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে। এবার বোধ হয় সনাতনের মনে হল জীবনটা তার একটা আশ্চর্য শূন্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কেমন হয়ে গেল সনাতন। ছবি আঁকেনা, কথা বলেনা কারুর সঙ্গে। খুনী! আমার মনে হয় এই একটি মাত্র আঘাত—এবং সব চাইতে অপ্রত্যাশিত নির্মম আঘাতই ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে।

দেখতুম, প্রায়ই চন্দ্রভাগার ধারে একটা কেয়াঝাড়ের ছায়ায় সনাতন চুপ করে বসে থাকত। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত নদীর জল, আকাশে লাল মেঘ, আর বহুদূরে ঝাউবনের ওপারে কোণারকের মন্দিরের কালো চুড়োটা। ছেলেবেলার সহজ সংস্কারেই আমি কেমন যেন বুঝতে পেরেছিলুম সনাতন আর সে মানুষ নেই—সনাতন বদলে গেছে। ওকে এখন ভয় করত।

আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সনাতন, তুমি আর ছবি আঁকোনা ?

—না। সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

—কেন ?

সনাতন উত্তর দেয়নি। উঠে চলে গিয়েছিল।

তারপর ক্ষেত-গিরস্তিতে মন দিলে সনাতন, একেবারে পুরোদস্তুর চাষা বনে গেল। গাঁয়ের আরো দশজনের সঙ্গে তার কোথাও কোনো পার্থক্য রইলনা। যা বলছিলুম, শিল্পী সনাতনের মৃত্যু হল।

কিন্তু ওইখানেই শেষ হলনা।

জানোই তো, চাষবাসের পক্ষে সমুদ্রের বালি এদেশে—বিশেষ করে এ অঞ্চলটায় কিরকম বিশ্রী আর অস্বস্তিকর। হাওয়ায় সারাক্ষণ বালি উড়ে উড়ে এসে পড়ছে—প্রায়ই ক্ষেত পরিস্কার করতে হয়। আর নিয়মিতভাবে ক্ষেতের বালি সরাতে না পারলে জমির দফা একেবারে ঠাণ্ডা।

সেবার সমুদ্রে ঝড় এল।

অমন ভয়ঙ্কর ঝড় বিশ বছরের মধ্যে হয়নি। সারারাত ধরে চলল বৃষ্টি আর বাতাসের মাতামাতি, তিন চার মাইল দূর থেকেও সমানে শোনা যেতে লাগল উত্তেজিত ক্ষুব্ধ সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গোঙ্‌রানি! ঝাউবন উপড়ে পড়ল, গ্রামে ঘর উড়ে গেল, বান ডেকে গেল নীলস্রোতা শান্ত চন্দ্রভাগায়। দুদিন পরে সে দুর্যোগ যখন থামল, তখন দেখা গেল সর্বনাশ শুধু সনাতনেরই হয়নি। কোথায় ক্ষেত —কোথায় বা সেখানে নতুন ধানের তাজা তকৃতকে শীষ! বালি—সব বালি! যতদূর চাও শুধু অভিশপ্ত বালির বিস্তার, মাঝে মাঝে উচ্চচূড় বালিয়াড়ী। সবুজ, শস্যের ঐশ্বর্যে ভরা মাটি একরাত্রে দিগন্ত সমাকীর্ণ একটা অতিকায় মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

যে ক্ষেত-খামারের জন্যে এত সমস্যা, তার সমাধান ঘটে গেল। যে ঘর-সংসার রাখবার জন্যে এত বিরোধ, সে সংসার আগেই ভেঙেছে, আজ ঘরও গেল।

আবার নিরুদ্দেশ হল সনাতন, আর ফিরলনা।

অবশেষে বছরতিনেক আগে দেখা হয়েছিল ভুবনেশ্বর স্টেশনে। আমি আসছিলুম পুরীতে—এমন সময় ওকে দেখলুম। প্রথমটায় চিনতে পারিনি। তারপরে গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলুম।

সনাতন এখন পাণ্ডার দালাল। যাত্রী পাকড়াও করে বলছে, বাবুর নামো কী অছি? পাণ্ডার নামোটি কী অছি?

আমি ডাকলাম, সনাতন, চিনতে পারো?

চমকে উঠল সনাতন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। অদ্ভুত রকমের বুড়ো হয়ে গেছে, ঝুলে পড়েছে চোখের চামড়া। মালটানা গাড়ির গোরুর মতো একটা মন্থর ক্লান্তি যেন আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তাকে। মনে হল, এ সনাতন নয়—সনাতনের 'মমি' একটা।

আমি সেই পুরোণো প্রশ্নটা করলুম আবার: আর ছবি আঁকোনা সনাতন?

সনাতন হাসল। বললে, কে, রাঙাবাবু? কত বড় হয়ে গেছো আজকাল! ভালো আছো তো?

বললাম, ভালোই আছি। কিন্তু তোমার খবর কী? ছবি আঁকা কি ছেড়ে দিয়েছো?

সনাতন ম্লান হাসল: পারিনা। ও কাজ আমার নয় রাঙাবাবু। পাণ্ডার চাকরী করি—যাত্রী ধরি, খেতে পাই।

ট্রেন ছেড়ে দিলে। দেখলাম সনাতন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ অনুতাপ হল। যা ও ভুলে যেতে চায় তাকে এমন করে জাগিয়ে

না দিলেই বোধ হয় ভালো হত। যে মরেছে, তাকে জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই।

আজ ভাবি, শিল্পীর এই অপঘাতের জন্যে দায়ী কে? সংসারের স্বাভাবিক দাবী-দাওয়া? হয়তো তাই। সংসারকে রাখতে গিয়ে লোকটা শিল্পকে হারালো, কিন্তু প্রকৃতি তার সে সংসারকেও রাখতে দিলেনা। আশ্চর্যভাবে সর্বহারা হয়ে গেল সনাতন।

এই হয়—এই হবে। কোনো উপায় নেই। আজ আর কারো সাধ্য নেই কোণারকের উত্তরাধিকারীদের বাঁচিয়ে তুলতে পারে। কটকে ইউনিভার্সিটি হবে—হয়তো উড়িষ্যার কলাশিল্প নিয়ে গবেষণা হবে, থীসিস্ লিখে ডক্টরেট্ পাবে ছেলেরা। কিন্তু সনাতনেরা আর বাঁচবেনা, তাদের বাঁচানোর উপায় নেই। অথবা হয়তো উপায় আছে—কিন্তু পুরীর সী বিচ্ আর শহরের স্বাচ্ছন্দ্যে যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের সময় নেই বিস্মৃত তোষালীর ভাস্করদের খুঁজে বার করতে, অতীত কলিঙ্গের রূপদক্ষের নতুন কালে নতুন প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে তুলতে।

বিশ্বনাথ থামল, সিগারেটের টিনটা টেনে নিলে নিজের দিকে।

কোণারকের ঝাউবনে সন্ধ্যা নেমেছে। দূরে আবছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে আসছে সমুদ্র।

৺শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ,

৺শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডুর শ্রাদ্ধ-বাসরে আপনারা আমাকে যে দুকথা বলবার সুযোগ দিয়েছেন এজন্যে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমি নিতান্তই সামান্য ও অধম ব্যক্তি, এই গুরু দায়িত্ব পালন করবার ক্ষমতা আমার নেই। সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের অমর কীর্তিকলাপ বর্ণনা করবার মতো উপযুক্ত ভাষাও আমার নয়। তথাপি এই ভার যখন আমার ওপর অর্পিত হয়েছে, তখন আমি সংক্ষেপেই তাঁর সম্বন্ধে দুচার কথা নিবেদনের প্রয়াস পাব। আশা করি, ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনারা মার্জ্জনা করবেন। আর পরম ভাগবত পুণ্যশীল দানবীর ৺শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু আজ যাঁর চরণাশ্রয় লাভ করেছেন এবং যিনি আমার মতো নগণ্য ব্যক্তিকেও বিদ্বান এবং সুধীজন সমক্ষে দুকথা বলবার অনুপ্রেরণা দিলেন :

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।"

বাংলা ১২৯২ সালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার কুণ্ডুগ্রামে পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডুর জন্ম হয়। এই গ্রামের বহু কৃতী সন্তানের নামই বাংলার ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুপরিচিত। বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য যখন দিনের পর দিন মাড়োয়ারীদের করালগ্রাসে চলে যাচ্ছিল, সেই সময় এই গ্রামের সুসন্তানেরাই সাহস এবং প্রতিভাবলে অগ্রসর হয়ে জাতির সম্মান রক্ষা করেছেন। গোপীবল্লভ এঁদেরই মধ্যমণি ছিলেন।

গোপীবল্লভের স্বর্গীয় পিতৃদেব রাধাবল্লভ কুণ্ডুর অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল

ছিলনা। বজ্রযোগিনীর বাজারে তাঁর সামান্য একটি কাটা কাপড়ের দোকান ছিল। তার আয় থেকেই কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা চলত। তাই মৃত্যুকালে তিনি যৎকিঞ্চিৎ দশ হাজার মাত্র টাকা রেখে যেতে পেরেছিলেন।

শিশুকালে গোপীবল্লভ গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি তাঁর রুচি ছিলনা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন, কলেজীশিক্ষা আর ডিগ্রির মোহে বাঙালী অধঃপাতে গেল—কোন্ অলৌকিক প্রতিভাবলে নিতান্ত শৈশবেই গোপীবল্লভ এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এ একটা আশ্চর্য রহস্য। পরম করুণাময় ঈশ্বরের লীলাই এই। Morning shows the day—এই প্রবচনটি গোপীবল্লভের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

পাঠশালার নৃশংস পণ্ডিত সেই সুকুমার বালককে অনেক কঠিন শাস্তি দিয়ে পুঁথির বিদ্যা মুখস্থ করাতে চেয়েছিল। বেত্রাঘাত করত, বেঞ্চিতে দাঁড়ো করিয়ে রাখত—প্রখর রৌদ্রে পাঠশালার বাইরে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করত। কিন্তু নির্ভীক গোপীবল্লভ সেই অমানুষিক অত্যাচারেও কখনো আদর্শভ্রষ্ট হননি। ক্লাশের অন্য ছেলেরা প্রমোশন পেলেও তিনি পেতেন না—কিন্তু সেজন্যে দুর্বলের মতো তিনি কোনোদিন অশ্রু মোচন করেননি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও তিনি ক্ষুণ্ণ হতেননা বরং সেই সময়ে নারিকেল বৃক্ষে আরোহণ করে তিনি ডাব পাড়তেন, ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যেতেন। শিশুকাল থেকেই তিনি এইরকম দৃঢ় চরিত্রবলে বলীয়ান ছিলেন।

ইতিমধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে গোপীবল্লভকে পাঠশালার অধ্যয়ন ত্যাগ করতে হল। ঘটনাটির জন্য গোপীবল্লভের কোনো দায়িত্ব ছিলনা—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁকেই এর শাস্তিটা ভোগ

করতে হয়েছিল। ব্যাপার আর কিছুই নয়—কোন সহপাঠী বালক ইচ্ছা করেই হোক আর ভ্রমবশেই হোক তাঁর পাঠ্যপুস্তকের ভেতরে নিজের একখানা নতুন বই রেখে দেয়। বাড়িতে ফিরে গোপীবল্লভ সেখানি পান এবং দুখানা পাঠ্য বই তাঁর প্রয়োজন নেই বলে সরল-মনে তিনি বইখানি প্রতিবেশী অপর একটি বালককে বিক্রয় করে দেন। ঘটনাটি গুরুমশাইয়ের কর্ণগোচর হয় এবং শিক্ষকরূপী সেই নৃশংস জল্লাদ সরলমতি শিশুকে এমন বেত্রাঘাত করেন যে তার ফলে গোপীবল্লভকে সাতদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। গোপীবল্লভের পরম স্নেহশীলা মাতা ভামিনী দাসী এতে অত্যন্ত ব্যথিতা হয়ে পুত্রকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে আনেন এবং তার পর থেকে তিনি আর বাইরের শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পাননি।

তাঁর যথার্থ শিক্ষার সূত্রপাত করেন পিতৃদেব রাধাবল্লভ। তিনি তখন থেকেই প্রতিভাবান পুত্রকে দোকানে নিয়ে যেতে সুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই গোপীবল্লভ পিতার উপযুক্ত পুত্র হয়ে ওঠেন। যে সমস্ত বাকীর খরিদ্দার রাধাবল্লভের ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে নানা টাল বাহানা করত, সুযোগ্য গোপীবল্লভ বাক্য-কৌশলে অতি সহজেই তাঁদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে আনতেন। আপনারা যাঁরা তাঁর পরবর্তী জীবনের সঙ্গে সুপরিচিত, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর এই ক্ষমতাটি অব্যাহতই ছিল।

বাল্যকালেই প্রতাপপুর গ্রামনিবাসী রাজীবলোচন কুণ্ডু মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা তারাসুন্দরীর সঙ্গে গোপীবল্লভের শুভ পরিণয় হয়েছিল। মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই ভাগ্যবান গোপীবল্লভ পুত্রমুখ দর্শন করেন। আমাদের পরম স্নেহভাজন শ্রীমান কৃষ্ণবল্লভই সেই সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান।

পৌত্রলাভের সামান্য কিছুদিন পরেই রাধাবল্লভ ইহলোক ত্যাগ

করে বৈকুণ্ঠের অধিবাসী হন এবং তাঁর কাজকারবারের দেখাশুনার ভার গোপীবল্লভের স্কন্ধে পতিত হয়। পিতৃশোকের তীব্র শেল মর্মে মর্মে বিদ্ধ হতে থাকলেও কর্তব্যকর্মে গোপীবল্লভ কখনোই ত্রুটি করেননি। পিতার কারবার তিনি নিপুণ ভাবেই পরিচালনা করতে থাকেন এবং ব্যবসায় ক্রমশই উন্নতি ঘটতে থাকে।

এই সময় আর একটি দুঃখদায়ক ব্যাপার ঘটে যায়। অনুজ রামবল্লভের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় মামলা আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং হাকিম সম্ভবত উৎকোচ গ্রহণ করেই রামবল্লভের পক্ষে রায় দান করেন। ফলে গোপীবল্লভ পিতার দোকানের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ও বিতাড়িত হন এবং অতি অল্পের জন্যে চৌর্যাপরাধে কারাবাস থেকে নিষ্কৃতি পান। সংসারের এই বিশ্বাসঘাতকতায় কোমলপ্রাণ নিষ্পাপ গোপীবল্লভ অত্যন্ত মর্মপীড়িত হন এবং পিতৃভবনে বসবাস অসম্ভব বোধ হওয়াতে নিজের অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্যে কলিকাতা মহানগরীতে চলে আসেন।

উদ্যোগী পুরুষসিংহ চিরকালই লক্ষ্মীর বরলাভ করে থাকে—গোপীবল্লভের ন্যায় অনন্যকর্মা পুরুষও সে বরলাভে বঞ্চিত হলেন না। নিজের যে যৎসামান্য পুঁজি ছিল তাই দিয়ে তিনি প্রথমে পাটের 'ফাটকা বাজারে' স্বীয় ভাগ্য নিরূপণ করতে প্রয়াস পান। কিন্তু মাড়োয়ারী ও ভাটিয়াদের কুচক্রান্তে কিছু অর্থদণ্ডই তাঁর সার হয়। গোপীবল্লভের ধর্মপ্রাণ মন ফাটকা বাজারের হীনতা ও নীচতা সহ্য করতে পারলনা। তিনি জীবিকা নির্বাহের অন্য পন্থা সন্ধান করতে থাকেন।

মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও পৃথিবী থেকে পাপ দূরীভূত করণ গোপীবল্লভের আজীবন ব্রত ছিল। তাই পাপীদের শাস্তি দিবার জন্য এই সময়ে যে দুঃসাহসিক পন্থা তিনি অবলম্বন করেছিলেন তা

শুনলে আপনারা শিহরিত ও রোমাঞ্চিত হবেন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করবার জন্যে মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ যা করেছিলেন এবং প্রেমাবতার যীশুখ্রীষ্ট যেভাবে পতিতদের তারণ করতেন, একমাত্র তাদের সঙ্গেই তার তুলনা সম্ভব।

গোপীবল্লভ জানতেন: 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়—পাপীর সঙ্গে সমপর্যায়ী হয়ে তার পাপমোচন করতে হয়। আপনারা জানেন এই কলিকাতা মহানগরীতে একাধিক গণিকাপল্লী আছে। এগুলি আমাদের জাতীয় কলঙ্ক এবং পাপের আগার বিশেষ। যে সমস্ত চরিত্রহীন মদ্যপ এই সমস্ত কুস্থলে যাতায়াত করে তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে গোপীবল্লভ একটি অভাবনীয় পন্থা অবলম্বন করলেন।

নিজে তিনি পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন—ত্রিসন্ধ্যা তিনি বিষ্ণুমন্ত্র জপ করতেন। মাদকদ্রব্য তিনি জীবনে স্পর্শ করেননি এবং স্বনামধন্য জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। কিন্তু দুরাচার লম্পটদের চরিত্র শোধনের জন্যে তিনি এই সমস্ত পাপপল্লীতে পরিভ্রমণ করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। কলিকাতার বিশিষ্ট পরিবারের ধনী সন্তানেরা অবিদ্যার পাদপদ্মে যেভাবে যথাসর্বস্ব নিবেদন করছিল, তিনি তা রোধ করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

নিজের সামান্য যা কিছু অর্থের পুঁজি ছিল, তাই নিয়ে রাত্রিকালে এই পল্লীতে তিনি পরিভ্রমণ করতেন। মদ্যপ ধনীসন্তানেরা অসময়ে অর্থের প্রয়োজনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে তিনি সেই সময় হ্যাণ্ডনোট-যোগে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ দিতেন। তাদের মত্ততার সুযোগে তিনি শতমুদ্রা দিয়ে দশসহস্র মুদ্রার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিতেন এবং এই উপায়ে ক্রমে তিনি বহু চরিত্রহীন ধনীসন্তানকে অবিদ্যা গমনজনিত পাপ থেকে মুক্ত করেন। গোপীবল্লভ বলতেন,

"অর্থ ঈশ্বরের দান। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পুণ্যকর্ম, দেবালয় ও অতিথিশালা স্থাপন প্রভৃতি সংকার্য অর্থের ওপরেই নির্ভর করে। সুতরাং এই ঐশ্বরিক বস্তুকে যারা কদাচারে অপব্যয় করে, তাদের কাছ থেকে একে রক্ষা করাই ধর্মনিষ্ঠ মনুষ্যের কর্তব্য।" বস্তুত গোপীবল্লভ এই কর্তব্য পালনে সদা সজাগ ছিলেন। এর ফলে একদিকে যেমন মনুষ্যকুলকলঙ্ক অপোগণ্ড ধনীসন্তানেরা পাপকার্যে অর্থব্যয়ে অপারগ হয়, অন্যদিকে পরম করুণাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণের কৃপায় গোপীবল্লভ কিছু সঞ্চয়েরও সুযোগ পান।

অতঃপর গোপীবল্লভ কলিকাতার বড় বাজারে ছোট একটি কাপড়ের দোকান খোলেন। এ সময় বহু প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়। কিন্তু অপরিসীম শক্তি ও মেধাবলে তিনি এই সমস্ত প্রতিবন্ধক বিচূর্ণ করতে সক্ষম হন। শ্রীভগবানের অপার অনুগ্রহে তাঁর ব্যবসা বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং পরিশেষে ব্যবসায়ীমহলে তাঁর নাম সসম্মানে উচ্চারিত হতে থাকে।

তাঁর ক্রমোন্নতির ইতিহাস সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং সে সম্পর্কে অধিক বাগ-বিস্তার করে আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। শেষ জীবনে একটি কাপড় ও আর একটি চিনির কল প্রতিষ্ঠা করে তিনি বাঙালির বাণিজ্যক্ষেত্রে যুগান্তর সূচিত করেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান আমাদের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান কৃষ্ণবল্লভ ও শ্রীমান ব্রজবল্লভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমে আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

শুধু ব্যবসায়ী হিসাবেই নয়, ভক্ত বৈষ্ণব হিসাবেও তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের জন্যেও তিনি যে কী গভীর মর্মবেদনা অনুভব করতেন এ সংবাদ আপনারা অনেকেই জানেন না। তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যেরও তুলনা ছিলনা। এ বিষয়ে আমি

সামান্য দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করেই তাঁর মহত্ত্ব প্রমাণের প্রয়াস পাব।

কিছুদিন পূর্বে তাঁর গোপীবল্লভ কটন মিলের একদল দুর্বৃত্ত শ্রমিক অন্যান্য শ্রমিকদের প্ররোচনা দিয়ে ধর্মঘট বাধাবার চেষ্টা করে। আপনারা সকলেই জানেন ইতর শ্রমজীবীরা আজকাল কী পরিমাণে অবাধ্য ও দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। তাদের হাস্যকর ও অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া পূরণ করতে গেলে জাতির ব্যবসা বাণিজ্য তিন দিনেই বন্ধ করে দিতে হয়। মনে আছে একদিন গোপীবল্লভ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বক্তাকে বলেছিলেন, "দেখুন, যাদের টাকা, মস্তিষ্ক ও চেষ্টায় এই কলকারখানা গড়ে উঠল আজ তাদের বঞ্চিত করে, তাদের ন্যাষ্য লাভের অংশে লোভ করা কি অত্যন্ত অন্যায় নয়? শ্রমিকের প্রয়োজন ও মালিকের প্রয়োজন এক হতে পারে না, হাতী ও পিপীলিকার খাদ্য কখনো সমান হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। শ্রমজীবীদের লোভ আজ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—দেখবেন মৃত্যু ওদের অবধারিত।"

গোপীবল্লভের দূরদর্শিতা যে কি অসাধারণ ছিল, এই উক্তিই তার সার্থক প্রমাণ। ধর্মঘটের ফলে কর্তব্যের তাগিদে তিনি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হন এবং পরিণামে পুলিশের গুলি-বর্ষণে তিনজন শ্রমিক প্রাণ হারায়। তবে দুষ্ট ব্যক্তিদের চক্রান্তে শ্রমিকদের অবৈধ দাবী কিছু পরিমাণে তাঁকে মেনেও নিতে হয়। মনে আছে এই সময় তিনি সক্ষোভে বলেছিলেন, "এই জন্যেই বাঙালীর কিছু হয় না। আমার সৌভাগ্য যে-সমস্ত পরশ্রীকাতরদের সহ্য হয় না তারাই শ্রমিকদের উস্কানি দিয়ে আমার এই অনিষ্ট করল। যতদিন পর্যন্ত এই ঈর্ষ্যা ও পরানিষ্টপ্রবণতা দূর না হবে ততদিন পর্যন্ত জাতির উন্নতি নেই—জাতীয় স্বাধীনতাও সুদূরপরাহত।" তাঁর এই

সারগর্ভ উক্তি সুধীজনের বিশেষভাবে চিন্তনীয় বলেই আমার মনে হয়।

তাঁর চিনির কল একটি লিমিটেড কোম্পানী এবং বহু মধ্যবিত্ত পরিবার এর অংশীদার বা শেয়ার-হোল্ডা'র। এই প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের ওপরে তাদের অন্ন সংস্থান হয়ে থাকে। নিজে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ও বারো আনি অংশীদার হয়েও অন্যান্য অংশীদারদের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। এখানেও শ্রমিক বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটায় সাধারণের স্বার্থসংরক্ষণের জন্যে তাঁকে কঠোর হস্তে দণ্ডধারণ করতে হয়। তিনি ব'লেছিলেন, "আমি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। অন্যান্য যাঁরা আমাকে বিশ্বাস করে এখানে তাঁদের টাকা খাটাচ্ছেন, শ্রমিকদের অন্যায় দাবী মেনে নিয়েও তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে আমি বিশ্বাস ঘাতক হতে পারব না।" তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যবোধ সব সময়েই এই রকম সজাগ ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকত।

সনাতন ধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আজীবন অচল ছিল। আধুনিক সমাজের ধর্মহীনতা তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করত। বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষার নামে আজ যে ব্যাভিচারের স্রোত দেশময় প্রবাহিত হচ্ছে তিনি তার তীব্র বিরোধীতা করতেন। তিনি বলতেন, "মাতৃজাতির শিক্ষা অন্তঃপুরে, সন্তান্ পালন এবং পরিজনদের সেবার ভিতরে। ইংরেজি শিক্ষা মেয়েদের বিবিয়ানাই শেখায় মাত্র। তারা নারীর আদর্শ ভুলে গিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশাই পছন্দ করে, সিনেমার মোহে বিভ্রান্ত হয় এবং স্বামী ও গুরুজনদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে স্বেচ্ছাচারিতায় কাল হরণ করে।" এই উক্তি যে কতদূর সত্য আশা করি ভুক্তভোগীদের তা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হবে না।

এই কারণেই নিজের কন্যা ও পৌত্রীদের তিনি স্কুল কলেজের বিষময়ী শিক্ষার সংস্পর্শ থেকে সযত্নে দূরে রেখেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে যখন কুখ্যাত "রাও বিল" প্রবর্তনের চেষ্টা হয় তখন গোপীবল্লভ এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ ঘোষণা করেন। ইংরেজ সরকার আমাদের জাতীয় ধর্মকর্ম প্রভৃতির ওপরেও যে হস্তক্ষেপ করবে, তাঁর স্বাধীন চিত্ত ও নির্ভীক বিবেক তা কখনোই সহ্য করতে পারত না। এই থেকেই আমরা তাঁর প্রবল জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাই।

সম্প্রতি দেশে রাজনীতি নিয়ে যে মাতামাতি চলছে গোপীবল্লভ তা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, "আন্দোলন করে বা বিপ্লব করে স্বাধীনতা আসে না। ইংরেজ আমাদের শত্রু নয়। তা ছাড়া তারা রাজা—আমাদের শাস্ত্রে রাজদ্রোহিতা মহাপাতক।" তাঁর মতে "স্বাধীনতা অর্থ হচ্ছে জাতির আর্থিক উন্নতি। সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। বরং ইংরেজ ভারত শাসন করলে একদিক দিয়ে সুবিধে আছে—পাকিস্তান আর হিন্দুস্থানের জটিল সমস্যাটার উদ্ভবই হবে না। তা ছাড়া নিজেদের দেশ স্বাধীন করবার যোগ্যতাও এ পর্যন্ত আমাদের আসেনি, কারণ দেশীয় শিল্পপতিদের অনিষ্ট কামনা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে রাজী নই।" উগ্র রাজনৈতিক মত্ততাসম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি একটু স্থির চিত্তে কথাগুলো প্রণিধান করেন, তা হলে এ থেকে তাঁরা উপকৃত হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। স্বাধীনতার আন্দোলন করলেই যে দেশের কল্যাণ হয় না এ কথা বোঝবার সময় কি আমাদের আজও আসেনি ?

আমার ভাষণ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই একান্ত অনুকরণীয় মহৎ চরিত্রটি সম্পর্কে আরো দু'চারটি কথা না বললে আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেই দু'চারটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

তেরশো পঞ্চাশ সালে যে ভয়ঙ্কর মন্বন্তর সমগ্র বাংলা দেশকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, তার মর্মভেদী করুণ দৃশ্য আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বিস্মৃত হননি। সরকারের অপরিণামদর্শিতা যে এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তা আপনারা সকলেই জানেন। গোপীবল্লভ এই সময় সরকারী নীতির সুতীব্র সমালোচনা করতেন। এ সময়ে তিনি সামান্য কিছু ধান চাল স্টক করেছিলেন সত্য, কিন্তু অন্যান্য অসাধু ব্যবসায়ীদের মতো তা থেকে তিনি নির্বিচারে লাভ করেননি—মাত্র সামান্য তিন লাখ টাকা তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য হিসাবে সঞ্চয় করেছিলেন। স্বীয় গ্রাম কুণ্ডুগ্রামে তখন যে লঙ্গরখানা খোলা হয়, তাতে তিনি এক সহস্র মুদ্রা চাঁদা দেন। এ থেকে তাঁর দানশীলতার সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে পরম অহিতকর কণ্ট্রোল নীতির তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। এই কণ্ট্রোলের জন্যে আমাদের যে দৈনন্দিন কী অপরিসীম দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে আপনাদের তা অবিদত নয়। গোপীবল্লভ সব সময়েই বলতেন, "সরকারের এই কণ্ট্রোলের দুর্নীতি যতদিন দূরীভূত না হচ্ছে ততদিন দেশ থেকে দুর্ভিক্ষ যাবেনা।" কথাটি বর্ণে বর্ণে যে সত্য তাতে আর সন্দেহ কী!

তাঁর তেজস্বী মন, বলা বাহুল্য, এই সরকারী অনাচার মেনে নিতে পারেনি। তিনি স্বাধীনভাবেই নিজের বাণিজ্য চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু একজন বাঙালি সাপ্লাই ইন্‌সপেক্টার তুচ্ছ পদোন্নতির আশায় তাঁর তিনখানা মালের নৌকো ধরিয়ে দেয় এবং সেজন্যে গোপীবল্লভের প্রচুর ক্ষতি ও অর্থদণ্ড হয়। এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বাঙালিকে বাঙালি না রাখিলে কে রাখিবে-একথা সম্পূর্ণ মিথ্যে। বাঙালি সব সব সময় বাঙালির সর্বনাশের চেষ্টা করে।" এই সমস্ত ব্যাপারে শেষ

জীবনে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন এবং এ হতাশা অমূলক নয়।

তাঁর পুণ্যকর্ম আপনাদের সুবিদিত। স্বপল্লী কুণ্ডুগ্রামের 'বৈষ্ণব তোষিণী সভা'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। ৺শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি যে গোপীবল্লভের মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তা ব্রজমণ্ডলের অন্যতম সম্পদ। তাঁর কারবারে এবং কলে বহু দেশবাসীর অন্ন-সংস্থান হয়ে থাকে। সবদিক থেকেই তিনি যুগন্ধর মহামানব ছিলেন।

আজ তাঁর আত্মা ৺শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠলোকে ৺শ্রীশ্রীবিষ্ণুর চরণাশ্রয় লাভ করেছে। তাঁর দেহান্তরিত মহাপ্রাণী সেখানে পরমা শান্তি লাভ করুক। তাঁর জীবনের আদর্শ ও সত্যকে অবলম্বন করে আমরাও যেন আমাদের উপযুক্ত রূপে গড়ে তুলতে পারি—আজ এইমাত্র আমাদের কামনা।

ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি! শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু!

উস্তাদ মেহেরা খাঁ

চার পুরুষ ধরে এঁদের গানবাজনার সখ। প্রথম যিনি, তিনি নাকি ছিলেন অদ্বিতীয় তবলচী। সারা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি আসরে বসলে বুক দুরু দুরু করত দিল্লী লক্ষ্ণৌয়ের সব নামজাদা ওস্তাদদের। একবার বেতালা হলে আর রক্ষা ছিলনা, হাতখানা বাঁয়ার ওপরে না নেমে সোজা গিয়ে নামত অসতর্ক গাইয়ের গালে। যখন বাজাতেন তখন আঙুলগুলো তাঁর চোখে পড়ত না, তাঁর তবলা-লহরা শুনে মনে হত যেন দ্রুত জলদে সেতারের ঝঙ্কার বেজে চলেছে।

দু বছরের ছেলেকে কোলে বসিয়ে তবলার পাঠ দিয়েছিলেন তিনি। ছেলে বাপের চাইতেও বড় ওস্তাদ হয়ে উঠলেন। শোনা যায় শেষ বয়সে তিনি আর তবলা বাজাতেন না। কেউ জিজ্ঞেস করলে নিবিড় ক্ষোভের সঙ্গে বলতেন, সঙ্গত করবার মত একটা গাইয়েই নেই, ও বাজিয়ে আর কী করব।

বোধ হয় সেই দুঃখে নিজের ছেলেকে তিনি আর তবলা ধরালেন না। তবু হয়তো বা রক্তের সংস্কারে নিজের তাগিদেই তৃতীয় পুরুষ ধরলে সেতার আর গান। আর সেই সময়েই আবির্ভাব হল উস্তাদ মেহের খাঁয়ের। মেহের আলীর সংক্ষেপ হয়েছে মেহেরা, অতিরিক্ত আকারটার তিনি প্রতিবাদ করেন না, লোকেও নিরঙ্কুশ।

এখন চতুর্থ পুরুষের যুগ চলছে। আগের তিন পুরুষের চাইতে একেবারে আলাদা। বাঁশি বাজায়, বাজায় বিলিতি বাজনা গীটার। আকারে প্রকারে পুরোদস্তুর হাওয়া লেগেছে আধুনিক কালের। পূর্ব-

পুরুষেরা মাত্র সরস্বতীর বীণাপাণি রূপটাই দেখেছিলেন, কিন্তু বিচিত্র ব্যতিক্রমের মতো চতুর্থ পুরুষ তাঁর জ্ঞানপদ্মের দুটি চারটি পাঁপড়িও সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, যে নরোত্তম চৌধুরী গাড়িতে চেপে বসলে চাকা খসে পড়বার আশঙ্কা হত, তাঁর বংশধর বলে বিশ্বাস করা শক্ত।

শুধু উস্তাদ মেহেরা খাঁ কোলের কাছে টেনে নেন তানপুরাটা। গুন গুন করে গান করেন দাদুর পদ :

"ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়াল বজাওয়ি,
যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি ন আওয়ি—"

"যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি না আওয়ি।" যে দিন যায় সে আর ফিরে আসে না। একথা উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের চাইতে কে আর বেশি করে জানে!

কোথা থেকে কোথায়! নিজের কাছে নিজেকেই এখন একটা অপরিচিত মানুষের মতো মনে হয় উস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের। কপালের ওপরে কতগুলো রেখা ফুটে ওটে এলোমেলো ভাবে, বাইরে যে চোখ তাঁর ঝাপসা হয়ে এসেছে, মনের ভেতরে তা যেন ঝলমলিয়ে ওঠে দৃষ্টি-প্রদীপের আলোতে। শুধু তাও নয়। বাইরে ক্রমশ সমস্ত আবছা হয়ে আসছে বলেই বোধহয় মনের নিভৃতে আপাত বিস্মরণগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভাস্বর হয়ে উঠেছে অন্তর্মুখিনতার দীপ্তিতে।

ঘরের দাওয়ায় সতরঞ্চ পেতে চুপ করে বসে ছিলেন উস্তাদজী। একপাশে সেতারটা পড়ে আছে। বাজাবার জন্যে নয়, কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। যখন বাজান না, তখনও অন্যমনস্কভাবে সেতার কিংবা তানপুরার ওপরে একখানা হাত ফেলে রাখেন তিনি। অন্ধের লাঠির মতো ওরা হাতের কাছে না থাকলে কেমন অসহায়

মনে হয় নিজেকে, বোধ হয় নিরাশ্রয়। অথবা সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে স্বরলক্ষ্মীর কাছ থেকে যে সম্পদ তিনি পেয়েছেন, কৃপণের ধনের মতো সে সঞ্চয়কে তিনি চোখের আড়াল করতে পারেন না।

দূরে কোথায় সানাই বাজছে—বিয়ের আয়োজন চলেছে কোথাও। উস্তাদজী উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। বেহাগ ধরেছে লোকটা। বেশ বাজাচ্ছে—শিক্ষা আছে মনে হয়। কিন্তু একি! মেহেরা খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তাল কাটল। আবার, আবার, আরে আরে এ কী হচ্ছে! উত্তেজনায় হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসলেন তিনি —পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা? বেহাগের সঙ্গে খাম্বাজকে মিশিয়ে ফেলল যে!

নৈরাশ্যে এবং ক্ষোভে উস্তাদজী আবার এলিয়ে দিলেন নিজেকে। অস্ফুট স্বরে বললেন, বেকুফ, বেতমিজ!

এটা বাঁধা গালাগালি। যে কোনো বিরক্তি আর অসন্তোষের প্রতিক্রিয়ার মতো ওই দুটি কথা বেরিয়ে আসে উস্তাদজীর মুখ দিয়ে। কথা দুটো শিখেছিলেন গুরুদেব আল্লাবক্সের কাছে, শিষ্যেরা ভুলচুক করলে গর্জে উঠতেন তিনি: বেওকুফ বেতমিজ কাঁহাকা। গুরুর অন্যান্য দোষগুণের সঙ্গে শিষ্যও এ দুটি আয়ত্ত করেছেন উত্তরাধিকারের সূত্রে।

শানাইওলার বাজনাটা যেন ছুরির খোঁচার মতো এসে ঘা দিচ্ছে কানে। মেহেরা খাঁ আবার বললেন, বেতমিজ, বেকুফ!

এরই ভেতরে শঙ্কর কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে গাল দিচ্ছেন ওস্তাদজী?

মেহেরা খাঁ মুখ ফেরালেন। কথাটার জবাব না দিয়ে বললেন, আও বেটা, বৈঠো।

পাশের সতরঞ্চে বসল শঙ্কর। তারপর আবার প্রশ্ন করলে, কিন্তু গাল দিচ্ছেন কাকে ?

ভ্রূকুঞ্চিত করলেন উস্তাদজী। বললেন. শুনতে পাচ্ছ ?

—কী ?

—ওই শানাই ?

—ওঃ! শঙ্কর হাসল—ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে। বললে, ভুল বাজাচ্ছে বুঝি ?

—শুধু ভুল! আর একটা ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গি করলেন উস্তাদজী : যা তা তাল কাটছে, সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু বেহাগের সঙ্গে খাম্বাজ মিশিয়ে বেইজ্জৎ করে দিয়েছে একেবারে। কান ধরে দুই থাপ্পড় দেওয়া উচিত বেকুফের।

শঙ্কর বললে, ভুলটা কিন্তু আপনারই উস্তাদজী।

উস্তাদজী প্রায় সিংহের মতো হুঙ্কার করে উঠলেন : আমার ভুল ? কোন্ বেতমিজ—

হাসিমুখেই শঙ্কর বাধা দিলে। বললে, আপনি বুঝতে পারেন নি।

—আমি বুঝতে পারিনি! এবার আর ক্রোধ নয়, বিস্ময়ে আর বেদনায় মেহেরা খাঁ যেন হতবাক হয়ে গেলেন : এই চল্লিশ বছর ধরে আমি তবে কী করেছি!

উস্তাদজীর বেদনার্ত আহত মুখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতি বোধ করল শঙ্কর। কোমলভাবে বললে, আপনি ঠিকই করেছেন। কিন্তু এতো তা নয়। ও লোকটা বেহাগ বাজাচ্ছে না, বাজাচ্ছে আধুনিক একটা গান।

—ওঃ, আধুনিক গান। মুহূর্তে উস্তাদজী যেন নিভে গেলেন। একবার অসহায় দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিতভাবে। কিছু একটা বলা উচিত, কোনোরকম একটা আশ্বাস দেওয়া উচিত উস্তাদজীকে। কিন্তু কোনো কথা মুখে এলোনা তার। মৃদু একটা নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে শঙ্কর চলে গেল বাড়ির ভেতরে।

আধুনিক! আধুনিক কাল—আধুনিক গান! সেতারের ওপর হাতটা অস্থির হয়ে উঠল মেহেরা খাঁর, ঝনাৎ করে সাড়া দিয়ে উঠল তারগুলো। উস্তাদজীর মনে হল আহত যন্ত্রণার একটা আকস্মিক আর্তনাদ যেন সাড়া দিয়ে উঠেছে সেতারটা থেকে। এতদিন ধরে ওর তারে তারে জেগেছে বিশুদ্ধ সুরে লয়ে বিস্তারে নানা রাগ-রাগিণীর আলাপ; ওর তারে তারে ভৈরোঁ পূরবীর প্রশান্তি পড়েছে ধ্যানমূর্ছিত হয়ে, ওর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে মেঘমেদুর নীলিম দিনের বাদল মৃদং প্রতিধ্বনিত হয়েছে, গভীর রাত্রির স্তব্ধতায় ওর মৃদু করুণ মীড় আহ্বান জানিয়েছে লোকান্তপারের অশরীরীদের—তাদের নিঃশব্দ নিশ্বাস যেন অনুভব করতে পেরেছেন ওস্তাদজী; ওর দ্রুত কঠিন ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যেন বিলসিত হয়ে গেছে সুরের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎলেখা, ওর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জ্বলেছে সুরের মশাল।

কিন্তু আজ! এই মুহূর্তে উস্তাদজী যেন ওর আহত বুকের ভেতর থেকে অসহায় আর্তনাদ শুনতে পেলেন একটা। ওকি শুধুই আর্তনাদ, না মৃত্যুযন্ত্রণার গোঙানি?

আধুনিক কাল। হ্যাঁ—যুগ বদলেছে বইকি। যো দিন যাওয়ি সো বাহুড়ি ন আওয়ি। যে দিন গেছে সে আর ফিরবেনা। প্রবাহিত হয়ে চলে গেল যে সময়, উজানের মুখে সে আর ফিরে আসবেনা কোনো দিন।

আত্মমগ্ন দৃষ্টিটা তুলে ধরলেন মেহেরা খাঁ। কাল বদলায়, মানুষ বদলায়; কিন্তু যে পৃথিবী, যে প্রকৃতি থেকে তার বিন্দু বিন্দু মাধুর্যের

মতো ক্ষরিত হয়েছে সুর, আর সঙ্গীত, কই, সে পৃথিবী তো বদলায়নি! আশ্চর্য সবুজ আর স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে দূরের বনরেখাকে, সকালের রোদে ঝলমল করে উঠেছে সামনে খালের ঘোলা জলটা, ওই শানাইয়ের অস্বস্তিকর ভুল বাজনাটাকে ছাপিয়েও দোয়েলের শিস্ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। চল্লিশ বছর আগে যা দেখেছিলেন আজও তা তেমনিই আছে—কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম হয়নি তার। শুধু সময় বদলেছে—বদলে গেছে মানুষ।

বদলে গেছে মানুষ। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে কথাটা ভাবতে গিয়ে নিজেই চমকে উঠলেন উস্তাদজী। বদ্লাবেই তো—উপায় নেই, রোধ করা যাবেনা তাকে। মেহেরা খাঁ নিজেই কি কম বদলেছেন? চল্লিশ বছর আগেকার একখানা ভুলে যাওয়া মুখ হঠাৎ আলো হয়ে উঠল মনের কালো অন্ধকারের ওপরে। আজকে কি ওই হারানো মানুষটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে আর?

বাইরের দৃষ্টিটা হঠাৎ ফিরে এল নিজের ভেতরে—সন্ধানী আলোর ঝলক ফেলে ফেলে কী যেন খুঁজতে লাগল সেখানে। একটা পোড়ো বাড়ির মতো অসংলগ্ন ধ্বংসস্তূপ—ভাঙা খেলনার টুকরো যেন ছড়িয়ে আছে এদিকে ওদিকে। নানা রঙ, নানা আকার। ছেলেমানুষি কৌতুক বোধ হয়, অকারণ কৌতূহলে কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করে ওই ভাঙা টুকরোগুলোকে, জোড়াতাড়া দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—

সন্ধানী আলোর অর্থহীন সন্ধান এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, শিউরে উঠল আলোকবৃত্তটা। জীবনের সব কিছুই খেলনা নয়, সব কিছুই ভাঙা খেলনার টুকরো নয়। ওই আলোকবৃত্তটার ভেতরে ছায়াবাজীর মতো কতগুলো বিশৃঙ্খল ছবি ফুটে উঠছে। উস্তাদজী চোখ বুজলেন। হ্যাঁ—চেনা যাচ্ছে বইকি। একটা শহর—মস্ত বড় শহর। তার নাম দিল্লী।

হাতীর মতো অতিকায় চেহারা, টুকটুকে রঙ—ফুলো মস্ত গাল দুটো থেকে যেন ফুটে পড়ছে রক্ত, লাল লাল চোখে নেশার জড়তা। উস্তাদ আল্লাবক্স। প্রকাণ্ড একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পড়ে আছেন পাহাড়ের মতো। পাঁচটা হীরের আংটি পরা মোটা মোটা আঙুলে ফরাসের ওপরে তাল বাজিয়ে চলেছেন তিনি। হঠাৎ পাহাড়ের মতো অত বড় শরীরটাতে যেন ভূমিকম্পের দোলা লাগল, বিশাল পুরুষ পিঠ খাড়া করে উঠে বসলেন তাকিয়া ছেড়ে। তারপরে মস্ত বড় একখানা হাত সস্নেহে নেমে এল মেহেরা খাঁয়ের কাঁধের ওপরে। আল্লাবক্স বললেন, সাবাস বেটা, সাবাস। তোর জন্যে আজ আমার অহঙ্কার হচ্ছে। আল্লাবক্স খাঁ একদিন থাকবেনা, কিন্তু সেদিনও লোকে নাম করে বলবে উস্তাদ মেহেরালী খাঁ তারই শিষ্য।

জীবনের সব চাইতে বড় পুরস্কার সেদিন পেয়েছিলেন মেহেরা খাঁ, চোখে তাঁর ছলছল করে উঠেছিল অশ্রু। আনন্দে, আবেগে যেন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। পাঁচ বছর বয়সে যে সাধনা স্থুরু করেছিলেন, আজ পচিশ বছর বয়সে তা সার্থক হল। তানপুরা ফেলে দিয়ে তিনি উস্তাদজীর পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়েছিলেন, হিন্দু শিষ্যদের মতো তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় মেখেছিলেন তিনি।

গুরু জয়পত্র দিলেন, করলেন আশীর্বাদ। সেদিন মন ভরে গিয়েছিল মেহেরা খাঁয়ের, বুক দুলে উঠেছিল গর্বের উল্লাসে। সামনে পড়ে আছে পৃথিবী। জয় করতে হবে তাকে, নিজেকে প্রমাণিত করতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে ‘সারে হিন্দুস্তানের’ জ্ঞানী গুণীর দরবারে। গুরু তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন, কেউ আগলে দাঁড়াতে পারবেনা তাঁর জয়যাত্রার পথ। কিন্তু—

কিন্তু জীবনে কতবড় পরাজয় যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, সে কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন মেহেরা খাঁ?

হঠাৎ নড়ে চড়ে তিনি নিজেকে সজাগ করে নিলেন। যে স্রোত আর ফিরবেনা, কী হবে তার কথা ভেবে? ঠিক কথা, আধুনিক কাল। মনের অন্ধকারে খানিকটা ছায়াবাজীর মতো আকস্মিকভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা সেই দিল্লী শহর আবার ডুব দিয়েছে অবচেতনার গভীরতায়। যা গেছে তাকে যেতে দাও, যা হারিয়ে গেছে, চিরদিনের মতোই হারাতে দাও তাকে। এ শহর দিল্লী নয়। বাংলা মুলুকের ছোট একটি গ্রাম—যার নাম নরোত্তমপুর। এখানে বাগ-বাগিচা নেই, নবাবী কেল্লা নেই, নেই হীরামহল মোতিমহল, চকবাজার আর জনতা। এখানে শুধু উজ্জ্বল নীল আকাশ, এখানে দোয়েলের শিস্, এখানে জলে ঝলমলে রোদ, এখানে সবুজ বনরেখার সুস্নিগ্ধ নিবিড়তা।

এই ভালো—এরই তো প্রয়োজন ছিল। কাল বদলাচ্ছে—বদলাক। মেহেরা খাঁয়েরও তো বদলাবার প্রয়োজন ছিল, নইলে কি তিনিই বাঁচতে পারতেন?

সেতারটাকে এবারে কোলের ওপরে তুলে নিলেন তিনি। সযত্নে হাত বোলালেন তারগুলোর ওপরে, যেন পরিচর্যা করতে চাইলেন তাঁর নিভৃত সেই ব্যথার কেন্দ্রলোকটাকে। একে ব্যথা দেওয়া চলবে না, দুঃখ দেওয়া চলবে না একে। এই সেতার মেহেরা খাঁয়ের আশ্রয়, আশ্বাস। পৃথিবীর পথে এই তো তাঁর চিরদিনের সহযাত্রী। তাই সেদিনের সেই পরম ব্যথার মুহূর্তেও—

ওস্তাদজী চকিতে সংযত করে নিলেন নিজেকে। বেওকুফ—বেতমিজ মন! একটুখানি ফাঁক পেলেই নিষেধ ভেঙে বেরিয়ে পড়তে চায়, সামলানো যায় না! দ্রুত আঙুলে সেতারে ঝঙ্কার দিলেন মেহেরা খাঁ। তারপর গুন গুন করে ধরলেন 'রুইদাসের' পদ :

নিত প্রভাত ভব তিঁবির ছুটে
অন্তর তিঁবির ছুটত নাহি।
সত্যরূপ প্রেমরূপ পহুঁ
পৈঠহুঁ আন্তর মাহি—”

আধুনিক কালের মানুষ শঙ্কর। বাঁশি বাজায়, বাজায় বিলিতী বাজনা গীটার। কিন্তু এ বাজনার পাঠ সে নেয়নি ওস্তাদ মেহেরা খাঁয়ের কাছ থেকে। ছেলেবেলায় কিছুদিন উস্তাদজী তাকে সেতার শিখিয়েছিলেন, তার পরেই সে চলে গেল কলকাতায়। তার শিক্ষা কলকাতাতেই।

কলকাতা। নতুন দিনের নতুন শহর। পুরোণো কালের দিল্লী আগ্রার মতো বনেদীয়ানা তার নেই; সোনা রূপোর জরি দিয়ে কাজ করা সেকেলে জাব্বাজোব্বা নেই, তার মাথায় নেই হীরেমুক্তো অপহৃত ছিন্নবিচ্ছিন্ন নবাবী তাজ। তার আমদরবার, দেওয়ান-ই খাস আর শিষ্‌মহলে ঝঙ্কৃত হয় না, মিঞাকি মল্লার আর বিলাসখানী টোড়ীর করুণ অনুরণন। তার আকাশ বাতাসে শোনা যায়না স্বপ্ন-গভীর অতীতের পদসঞ্চার। কলকাতা নতুন, কলকাতা আধুনিক। তার আকাশ ছোঁয়া লোহায় গাঁথা উদ্ধত নিরলঙ্কার বাড়িগুলোর সঙ্গে কোনো মিল নেই বিস্মৃত দিনের শিল্পীদের কারুকৃতার্থ দেওয়ান ই খাস আর চামেলী মহলের। তার নিরাভরণ বিশালতায় আলাপ আর বিস্তারের অলস ধ্যানগভীর ব্যাপ্তি নেই কোনোখানে, সেখানে সংক্ষিপ্ত আধুনিকতা, বাহুল্যহীন অগভীর আধুনিক গান।

তাই শঙ্করের বাবা জগন্নাথ চৌধুরী যে দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছিলেন উস্তাদ মেহেরা খাঁকে, শঙ্কর তা করে না। নবাবী আমলের পুরোণো

জাব্বাজোব্বার আতিশয্য কৌতূহল জাগায় কিন্তু আকৃষ্ট করে না শঙ্করকে। মনের দিক দিয়ে এক ধরণের করুণাই আছে তার উস্তাদজী সম্পর্কে। তাই রাগিণী সুরু করবার আগে দেড় ঘণ্টা ধরে তার আলাপ বিলাপের পর্ব খানিকটা অসহ্য প্রলাপের মতো মনে হয় শঙ্করের, মাথা ঘুরতে থাকে, বোঁ বোঁ করে একটা অস্বস্তিকর শব্দ বাজতে থাকে কানের ভেতরে। তবু ভদ্রতার খাতিরে বসে বসে ওই উৎকট ম্যাও ম্যাও আর 'মারি ঘং' শুনতে হয় তাকে, তারপর বিনীত হাসিতে বলতে হয়, হাঁ উস্তাদজী, গান তো একেই বলে! আজ-কালকার গান কি আর গান।

উস্তাদজী খুশি হন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। তবে সান্ত্বনা এই যে সে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে আজকাল, আবছা আর আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাই শঙ্করের মুখে চোখে অলক্ষ্যপ্রায় কৌতুকের ইঙ্গিতটা দেখতে পান না তিনি। সংশয় আর আবেগের মধ্যকেন্দ্রে দুলতে থাকে উস্তাদজীর মন। তানপুরায় একটা মৃদু আঘাত দিয়ে বলেন, আচ্ছা, তবে তোমাকে তুলসীদাসী ভজন শোনাই একখানা।

শঙ্কর আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। উস্তাদজীকে সে চেনে বিলক্ষণ। তাঁর ভজন আধুনিক ভজন নয়, আলাপ, বিস্তার এবং হা হা করে গিটকিরির সে ভজনের সঙ্গে ধ্রুপদের বিশেষ পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না শঙ্করের। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সে বলে, এখন ভজন থাক উস্তাদজী, ভীমপলাশীর পরে ভজন তেমন জমবে না।

পালাবার ছুতোটা বুঝতে কষ্ট হয় না মেহেরা খাঁয়ের। একটা নিশ্বাস চেপে নিয়ে তানপুরাটা সরিয়ে রাখেন তিনি।

বাপের গুরুদেবকে চটানো চলবে না, অন্তত যতটা সম্ভব লোক দেখানো শ্রদ্ধাটাও করতে হয় তাকে। কিন্তু আড়ালে হাসাহাসি

করে শঙ্কর। 'আবোল তাবোল' উদ্ধৃত করে বলে, "গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা"—

মাঝে মাঝে ক্ষীণ প্রতিবাদ করে শঙ্করের স্ত্রী রমা।

—ওঁকে এভাবে ঠাট্টা করা উচিত নয় তোমার। কতবড় ওস্তাদ উনি, বাবা কত শ্রদ্ধা করতেন ওঁকে। সাধনা করে উনি শিখেছেন, তোমাদের মতো ফাঁকির কারবার ওঁর নয়।

তর্ক করবার উৎসাহে পাঞ্জাবীর আস্তিনটা গুটিয়ে নেয় শঙ্কর: ওস্তাদ উনি নিশ্চয়, কিন্তু উনি যা করেন তা জিম্‌নাষ্টিক, তাকে গান বলে না।

রমা প্রশ্ন করে: তা হলে তুমি গান বলো কাকে?

—আমি তাকেই গান বলি যা কথা আর সুরের সমাবেশে অধিকার করে মনকে, দুলিয়ে দেয় প্রাণ। জানো এ সম্বন্ধে কী বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, কী লিখেছেন দিলীপ রায়?

রমা জানে না। এবং জানেনা বলেই সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে, তবে কি ওঁর গান গানই নয়?

শঙ্কর হাসে: একটা মুগ্ধবোধ ব্যকরণ, আর একটা রবীন্দ্রনাথের কাব্য।

—তার মানে?

—মানেটা অত্যন্ত পরিষ্কার। উনি গান শেখেননি, শিখেছেন গানের ব্যাকরণ। সেও অবশ্যি সেকালের ব্যাকরণ, কিন্তু সে কথা থাক। আসল ব্যাপারটা কী জানো? ব্যাকরণ পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায়, বাহাদুরী পাওয়া যায়, কিন্তু কাব্যরচনা করা যায় না। ওর জন্যে চাই আলাদা কবিপ্রতিভা, আলাদা একটা রসিক মন। সে মন ওঁর নেই।

রমা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, বলে, ও। কিন্তু এই যে

তোমাদের সব একঘেয়ে গান? চাঁদ, রজনীগন্ধা, বিরহের বালুচর, উদাসী পথিকের আকুল বাঁশির ডাক, আমি ভালোবাসা ভিখারী, প্রেমের চকোর—এগুলো বুঝি সব উঁচু দরের কবিতা?

মেয়েমানুষের বেশি তর্ক করাটা শঙ্করের পছন্দ হয় না, অন্তত এদিক থেকে চৌধুরীবংশের ঐতিহ্যটাকে কিছু পরিমাণে বজায় রেখেছে শঙ্কর। বিরক্ত হয়ে বলে, যা বোঝোনা তা নিয়ে কেন বাজে তর্ক করতে আসো বলতো তো?

—তর্ক করতে যাবো কেন? ওস্তাদজীকে তোমরা অসম্মান করো, এইটেই আমার ভালো লাগে না।

শঙ্করের গলার স্বর রূঢ় হয়ে ওঠে এবারে: অসম্মান কে ওঁকে করেছে? এ হল সমালোচনা। আর সমালোচনা করবার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে।

—কিন্তু আড়ালে হাসাহাসি করাকে কি সমালোচনা বলে?

শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়েই রমা বুঝতে পারে বজ্র-বিদ্যুৎ আসন্ন হয়ে এসেছে! সুতরাং ঝড়ের জন্যে আর অপেক্ষা না করে বুদ্ধিমতীর মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় রমা। পেছন থেকে সাপের গর্জনের মতো শঙ্করের চাপা স্বর শুনতে পাওয়া যায়: ইডিয়ট!

ইডিয়ট বলুক শঙ্কর, যা মুখে আসে, যা খুশি তাই, বলুক। কিন্তু মনের দিক থেকে গভীর আর নিবিড়ভাবে উস্তাদজীকে শ্রদ্ধা করে রমা, ওঁর সম্বন্ধে একধরণের সস্নেহ দুর্বলতা আছে তার। তা ছাড়া পুরুষ বলে যে জিনিষটা এড়িয়ে গেছে শঙ্করের চোখ, ঠিক সেইটেই ধরা পড়ে গেছে রমার দৃষ্টিতে। তার সন্দেহ হয় কোথায় গভীর একটা বেদনার জায়গা আছে উস্তাদজীর—কোথায় একটা—

মনে পড়ে তার বিয়ের সময়ের কথা। মস্ত আসর বসেছিল এ

বাড়িতে, বহু জ্ঞানী-গুণীকে কলকাতা থেকে আমদানি করেছিল শঙ্কর। ঝকঝকে আধুনিকের দল, মধুক্ষরা কণ্ঠ, কাব্যসঙ্গীতের চটুল উচ্ছল মায়া বিস্তীর্ণ করে দিয়েছিল তারা। আর সেই নতুনদের মাঝখানে কী বিচিত্র দেখাচ্ছিল উস্তাদজীকে, মনে হচ্ছিল কী অদ্ভুত-রকম বেমানান। পাকা চুল, পাকা দাড়ি, ময়লা পাজামা, অতিরিক্ত দীর্ঘ দেহ বলে একটু কোলকুঁজো, মিটমিটে চোখের দৃষ্টি। মাথা নিচু করে গান শুনছিলেন। হঠাৎ শঙ্কর বললে, উস্তাদজী, এবারে আপনি আমাদের কিছু গান শোনান।

যেন চমকে উঠলেন উস্তাদজী, যেন অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। কেমন ভারী ভারী জড়তাভরা গলায় উস্তাদজী বলেছিলেন, আমি?

—আপনি না গাইলে কি আসর হয়?—তানপুরাটা ঠেলে শঙ্কর এগিয়ে দিয়েছিল উস্তাদজীর দিকে।

অনাসক্তভাবে তানপুরা তুলে নিলেন তিনি, তারপর গান সুরু করলেন। গান তিনি কি গেয়েছিলেন বা কেমন গেয়েছিলেন তা বোঝবার ক্ষমতা সেদিন ছিল না রমার। তবে ঘোমটার আড়াল থেকে সকৌতুক দৃষ্টিতে দেখেছিল তাঁর ঘন ঘন মাথা নাড়া—আর অবাক হয়ে ভেবেছিল কী অসাধারণ গলার জোর! খানিক পরেই আধুনিকদের মুখে ফুটে উঠেছিল চাপা বাঁকা হাসি, পান চিবুতে চিবুতে একে একে তারা বেরিয়ে গিয়েছিল প্রায় সকলেই। আর তবলচী কয়েক মিনিট পরে সেই যে হাত তুলল, আর বাজায়নি। শুধু নির্নিমেষ চোখে অভিভূত হয়ে তাকিয়েছিল উস্তাদজীর মুখের দিকে।

কিন্তু কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই উস্তাদজীর। কে গেল, কে রইল কোনো কিছু তিনি লক্ষ্য করলেন না, নিজের মনেই ঝাড়া দেড়

ঘণ্টা তিনি গান করে গেলেন। গান যখন শেষ হল, তখন তবলচী এগিয়ে এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছিল। বিহ্বলভাবে বলেছিল, আপনি এখানে কেন পড়ে আছেন ? কলকাতায় চলুন।

উস্তাদজী শুধু মৃদু হেসেছিলেন, উত্তর দেননি।

তবলচী বলেছিল, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার মুখে এক খানা টোড়ী শুনতে চাই।

—টোড়ী !—শান্ত ঘুমন্তপ্রায় উস্তাদজী হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠেছিলেন একটা, বলেছিলেন, না, না, টোড়ী নয় টোড়ী নয় !—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যেন ভয় পেয়েছেন তিনি, যেন পালিয়ে যাচ্ছেন।

তবলচী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল—কী আশ্চর্য, এমন একটা রত্ন এই অন্ধকারে পড়ে আছে !

আর ঘোমটার আড়ালে সেই মুহূর্তে রমা একটা কিছু অনুমান করেছিল। যত দিন যাচ্ছে ততই নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস হচ্ছে সে অনুমানটা বোধ করি মিথ্যে নয়। আর সেই থেকেই উস্তাদজী সম্বন্ধে একটা মৃদু সহানুভূতিতে ভরে আছে রমার মন।

দেউড়ির পাশে ছোট একখানি ঘর। আজ পনেরো বছর আগে এই ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি, সেই থেকে আজ পর্যন্ত আর নড়ে বসবার দরকার হয়নি। অল্প প্রয়োজন, আয়োজন আরো অল্প। একটি ছোট খাট, ছোট বিছানা, টুকিটাকি দু চারটি জিনিসপত্র। একটি সেতার, দুটি তানপুরা। স্তব্ধ শান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ঘরটি।

কোলের ওপর সেতারটা টেনে নিয়ে টুং টাং করছিলেন উস্তাদজী। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ছায়া ঘনাচ্ছে ঘরের ভেতরে। আলো জ্বালাননি

মেহেরা খাঁ, এক একটি সন্ধ্যায় আলো জ্বালাতে ভালো লাগে না তাঁর। অন্ধকারের আড়ালে সমস্ত মনটা যেন কেন্দ্রগামী হওয়ার সুযোগ পায়, নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার অবকাশ ঘটে। উস্তাদজী অনুভব করেন, সেতারের প্রতিটি ঝঙ্কারের সাথে সাথে মনের গভীরে মণিপদ্ম একটির পর একটি দল মেলেছে তার, আর তাদের ওপর ফুটে উঠছে একটির পর একটি বিদ্যুৎদীপ্ত রাগ-রাগিণীর মূর্তি,—বাজছে কেদারা, ভীমপলশ্রী, সোহিনী, ছায়ানট, নটমল্লার, টোড়ী—

টোড়ী! উস্তাদজীর চমক লাগে। বীণাবাদিনী একটি নারী মূর্তি, তার কণ্ঠ থেকে বিরহের করুণ সঙ্গীত ঝরে পড়ছে আকাশ বাতাস বন-বনান্তকে আচ্ছন্ন বিবশ করে দিয়ে। তার সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছে একটি বনের হরিণী, তারও নীলিম আয়ত চোখ ছলছল করছে অশ্রুতে।

এই তো টোড়ী রাগিণীর রূপ। কিন্তু শুধুই কি রাগিণীর রূপ? শহর দিল্লী নয়—ছায়াবাজীর মতো আর একটা শহরের ছবি মনের সামনে ভাস্বর হয়ে ওঠে—যার সামনে নীল সমুদ্রের দোলা চলেছে অশ্রান্ত আনন্দে। তার নাম "মুম্বই"—লোকে যাকে বলে বোম্বাই। খোলা জানালা দিয়ে সেদিনও তো তেমনি চোখে পড়ছিল ওই নীল সমুদ্রের চঞ্চলতা, চাঁপাফুলের মতো ললিত অঙ্গুলি-বিন্যাসে যে "মিঞাকি টোড়ী" বাজিয়ে চলেছিল, তারও চোখে ছিল সমুদ্রের অতলান্ত অশ্রুর ইঙ্গিত, তার নাম—

তার নাম আশিক বাঈ।

কিন্তু ঝুটা, সব মিথ্যে। মিথ্যে আশিক বাঈ, মিথ্যে তার প্রেম। টোড়ী রাগিণী শুধু কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ভালোবাসে, সে কি ঠকায় কখনো? 'ই দেওয়ানা দুনিয়ামে সব কুছ হায় ঝুটা'—

ঘরের মধ্যে অন্ধকার আরো গভীর হয়ে আসছে। তবু তারই ভেতরে আচমকা উস্তাদজীর মনে হল দরজার কাছে কার যেন ছায়া পড়েছে।

—কে, ওখানে?

মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল, আমি উস্তাদজী।

—ওঃ। কিন্তু এভাবে না এলেই ভালো করতি বেটি।

—এ ছাড়া যে উপায় নেই উস্তাদজী।

—কিন্তু বেটি, এ লুকোচুরি বড় খারাপ। এ অন্যায়।

—কিছু অন্যায় নয়। আমি আলোটা জ্বালি।

কেটে যাচ্ছিল অভ্যস্ত দিন। শঙ্কর বাজাচ্ছিল বাঁশি আর গীটার—উস্তাদ মেহেরা খাঁ নিমগ্ন হয়েছিলেন তাঁর তানপুরা আর সেতারে। বয়স বাড়ছিল উস্তাদজীর, ক্ষীণ হয়ে আসছিল চোখের দৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে বিস্মরণগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল মনের নেপথ্যলোকে। আজ বিশবছর আগে উস্তাদ আল্লাবক্স মারা গেছেন, কিন্তু গভীর রাত্রিতে মালকোষ বাজাতে বাজাতে রোমাঞ্চিত মেহেরা খাঁ স্পষ্ট অনুভব করতেন যেন বিশালকায় পুরুষ তাঁর পাশে এসে বসেছেন। গোলাপী রঙের ফুলো ফুলো গাল, মেহেদী-রঙানো পাকা দাড়ি, দুচোখ নেশায় আরক্ত। সস্নেহে একখানা অশরীরী হাত তিনি রেখেছেন মেহেরা খাঁর কাঁধের ওপরে, জড়িত স্বরে বলছেন, সাবাস বেটা, তোর জন্যে আমার অহঙ্কার হচ্ছে।

"যো দিন যাওয়ি যো বাহুড়ি ন আওয়ি।" যে দিন চলে যায় সে আর ফিরে আসে না। স্রোতের মুখে যে সময় ভেসে চলে গেল, উজানের ধারায় জীবনে আর প্রত্যাবর্তন হবে না কোনোদিন। নাই বা হল, ক্ষতি কী তাতে। দিন বদলাচ্ছে বদলাক, কাল বদলাচ্ছে —তাকে বদলাতে দাও। আজ দাদুর ওই পংক্তিটার একটা নতুন

অর্থ যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। যা গেছে তার জন্যে ক্ষোভ করে লাভ নেই। লাভ নেই অকারণ বেদনায় নিজেকে আহত আর পীড়িত করে।

আশ্চর্য, সেই শহর বোম্বাইয়ের কথা ভাবতে গিয়ে তেমন করে আর যন্ত্রণায় সমস্ত মনটা আর্তনাদ করে ওঠে না। সেই নীল সমুদ্রের দোলায় আর দুলে ওঠে না অতলান্ত অশ্রুর আভাস। মানুষ বদলায় —আশিক্ বাঈও বদলে গিয়েছিল—প্রেমের প্রতিদান দিতে সে রাজী হয়নি, দেওয়ানা হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু আজ—এই এতদিন পরে নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করছেন উস্তাদজী। টোড়ী রাগিণী মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয় ভালোবাসা আর বিরহের অশ্রু। এক আশিক বাঈ যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, হাজার জনের চোখে তার প্রেম সত্য হয়ে রইল। সে প্রেমে উস্তাদজীর হয়তো অধিকার নেই, কিন্তু পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জীবনে তা তো সার্থক হয়ে উঠবে। একজনের বিরহ-অশ্রু যদি সত্য নাই হয়, তবু আরো হাজার হাজার ভাগ্যবানের জীবনে টোড়ী রাগিণী চিরন্তন হয়ে রইল।

আশিক বাঈকে পান্নি উস্তাদজী, কিন্তু আর একজনকে পেয়েছেন। কন্যার মতো নিবিড় স্নেহ দিয়ে তাকে প্রাণ খুলে শেখাচ্ছেন মেহের খাঁ, সমস্ত সম্বল দিতে চাইছেন উজার করে। যাকে দিতে চেয়েছিলেন সে নিতে পারল না। চোখের সামনে পৃথিবীর আলো যখন দিনের পর দিন নিভে আসছে তখন গভীর ব্যথার সঙ্গে এই কথাই বারে বারে মনে হত—তাঁর এতবড় সুরের ঐশ্বর্যকে কৃপণের সম্পদের মতোই আগলে গেলেন তিনি, কারো কোনো কাজে লাগল না। কিন্তু আজ সে অতৃপ্তি কেটে গেছে। পিয়ারীকে যা দিতে পারেন নি, বেটীকেই তা দিয়ে যাবেন।

কদিন থেকে ভারী প্রসন্ন আছে উস্তাদজীর মন। আর ক্ষোভ নেই, বেদনা নেই আর। এতদিন ধরে যেন একটা বোঝা বয়ে বেড়িয়েছেন তিনি, দেবার মানুষ ছিল না। শঙ্করের বাবা জগন্নাথ চৌধুরী কিছু নিয়েছিলেন, শঙ্কর একেবারেই নিতে পারল না। কিন্তু এমন আশ্চর্যভাবে আর একজন এসে হাত পেতে দাঁড়াবে একি কল্পনাতেও ছিল উস্তাদজীর ?

সকালে ঝিলিমিলি রোদ উঠেছে। ঝিলমিল করছে খালের জল। সবুজ অরণ্যে শিস্ দিচ্ছে দোয়েল, বসে বসে সেতারের কানে মোচড় দিচ্ছিলেন তিনি।

সকাল বেলাতেই এখানকার পোষ্ট অফিসে ডাক আসে। শঙ্কর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় খবরের কাগজের সন্ধানে। আজও সে কাগজ পড়তে পড়তে ফিরছিল।

উস্তাদজী ডাকলেন, শঙ্কর ?

শঙ্কর মুখ তুলল। সে মুখে যেন মেঘের রঙ। দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কার ভারে থম থম করছে। কিন্তু বয়েস বেড়েছে, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে উস্তাদজীর। শঙ্করের মুখের চেহারা তিনি ভালো করে দেখতে পেলেন না।

উস্তাদজী আবার ডাকলেন, একটা ভৈরোঁ শুনবে শঙ্কর ?

—এখন নয় উস্তাদজী, অনেক কাজ—শঙ্কর যেন তাঁকে এড়িয়েই বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

শুধু শঙ্করের মুখেই মেঘের রঙ ধরেনি—ঝোড়ো মেঘের কালো রঙ ধরেছে দেশের আকাশে। কলকাতায় কিছুদিন ধরেই সর্বনাশা দাঙ্গা সুরু হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের। প্রাসাদপুরী কলকাতা, আধুনিক কলকাতা রূপান্তরিত হয়েছে সুন্দরবনে। তার পথে পথে এখন হিংস্র জানোয়ারের ক্ষুধিত পদসঞ্চার।

এ খবর উস্তাদজী রাখেন না, এ সমস্ত তাঁর সংকীর্ণ জীবনবৃত্তের বাইরে। নিজের ছোট ঘরটি—নিঃসঙ্গ নিরালা জীবন, তাঁর সেতার আর তানপুরা, স্বপ্নের গভীরে শহর মুম্বই আর শহর দিল্লী। এতদিন এ খবর তাঁকে কেউ দেয়নি, তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেই যেন সজাগ ছিলনা কেউ। কিন্তু আপাতত তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠবার সুযোগ ঘটেছে।

কাগজ নিয়ে পোষ্ট অফিস থেকে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে শঙ্কর, এমন সময় চারপাঁচটি ছেলে এসে ঘিরে দাঁড়াল তার চারদিকে।

—আপনার সঙ্গে কথা আছে শঙ্করদা।

—আমার সঙ্গে ?

—হাঁ, খুব জরুরী কথা।

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

—ব্যাপারটা কিহে ?

চাপা গলায় একজন বললে, এখানেও লাগবে।

—সে কী !—শঙ্করের শরীরের ভেতর দিয়ে চমকে গেল একটা শীতল শিহরণ : কী লাগবে ?

—দাঙ্গা।

—বলো কী !—শঙ্কর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

—ঠিকই বলছি।—বিশ্বস্ত স্বরে ওদেরই আরেকজন বলে গেল, বাইরে থেকে বিস্তর লোকজন এসেছে পাশে পাশে। খালপারের মসজেদে রোজ ওদের গোপন জমায়েৎ হচ্ছে। গভীর রাত্রে মশাল জেলে লাঠি খেলছে সব। কাল দেখেছি শুরু মিয়ার বাঁশ ঝাড় থেকে লাঠি কাটছে।

—শুধু কি তাই ?—আর একজন বললে, রাম জেলের কাছে

চাঁদা চাইতে গিয়েছিল। বলেছে চাঁদা না দিলে ঘরবাড়ী লুটপাট করে নেবে।

বিবর্ণ মুখে শঙ্কর বললে, তবে আর কী হবে। তোমরাও তৈরী হয়ে যাও।

—তৈরী আমরা আছিই। কত ধানে কত চাল বেরোয় সেটা বুঝিয়ে দিতে পারব। কিন্তু আপনাকে একটু সাবধান থাকতে হবে শঙ্করদা, বিভীষণ রয়েছে আপনার বাড়িতে।

—আমার বাড়িতে! আকাশ থেকে পড়ল শঙ্কর: সে আবার কী!

—ওই উস্তাদজী।

—উস্তাদজী! শঙ্কর এবারে হো হো করে হেসে উঠল: মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমাদের। আজ পনেরো বছর ধরে এ বাড়িতে উনি আছেন—আমাদের একেবারে আপনার জন।

—ও কেউটে সাপের জাত শঙ্করদা। সব সমান। কলকাতায় কী হল জানেন না?

শঙ্কর তবু হাসছিল: উনি গুরুজন, বাবার গুরু। ওঁর সম্বন্ধে এসব কথা ভাবলেও পাপ হয়।

ছেলেরা চটে উঠল: আপনার পাপ পুণ্য নিয়ে তবে আপনি থাকুন। আমাদের কাজ আমরা করলাম, সাবধান করে দিলাম আপনাকে। পরে যদি কিছু একটা হয় আমাদের দোষ দিতে পারবেন না।

হাসিমুখেই শঙ্কর কথাটাকে উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে হাসিটা তার শুকিয়ে আসতে লাগল। দিনের পর দিন একই কথা, একই আলোচনা। চারদিকে একটা নিঃশব্দ অনিবার্য প্রস্তুতি যে চলেছে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। নিজের চোখেই শঙ্কর

দেখেছে খালপারের মসজেদে গভীর রাত্রে মশালের আলো—লাঠির ঠকাঠক শব্দ, দূরে কাছে নানা জায়গা থেকে টুকটাক খবর আসছে সব সময়ে। আর চোখ বুজে থাকা চলে না।

এতদিনে একটা নতুন সত্য আবিষ্কৃত হল শঙ্করের কাছে, খুলে গেল একটা নতুন দিক। উস্তাদজীর সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে একটি মাত্র পরিচয় মনের মধ্যে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল: উস্তাদজী গুণী নন, উস্তাদজী আর কিছু নন তিনি মুসলমান। এবং ফলে তাঁকে বিশ্বাস করা চলে না।

আজকাল তাই শঙ্কর একটা বিচিত্র নতুন চোখে তাকায় উস্তাদজীর দিকে। সে চোখে শ্রদ্ধা নেই, নবাবী আমলের আভিশয্যের প্রতি সকৌতুক কৌতূহল নেই কোথাও। আছে সন্দেহ, আর আছে বিশ্লেষণ।

কিন্তু উস্তাদজীর দৃষ্টি নিষ্প্রভ, তিনি বুঝতে পারেন না। একটা ছেলেমানুষি খুশির অকারণ জোয়ার এসেছে তাঁর ভেতরে. কেটে যাচ্ছে সেই ধ্যানপ্রশান্ত নির্লিপ্ততা। ডাক দিয়ে বলেন, আও বেটা তোমাকে একখানা জৌনপুরী শুনাই।

শঙ্কর সংক্ষেপে জবাব দেয়, কখনো জবাব দেয় না। নিজের আনন্দে উস্তাদজী একটার পর একটা রাগিণী বাজিয়ে চলেন, যেন বিস্মৃত যৌবন ফিরে এসেছে তাঁর। আর কালো মুখ করে শঙ্কর চলে যায় বাড়ির ভেতরে, উস্তাদজীর এই খুশি, এই আনন্দ—তাকে আরো বেশি সন্দিগ্ধ করে তোলে।

রমা একদিন জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কী? দিনরাত এত সব কী ভাবো?

ইতস্তত করে শঙ্কর বলে ফেলল।

প্রথম কথাটা শুনে যেভাবে শঙ্কর হেসে উঠেছিল, ঠিক তেমনি

করেই হেসে ফেলল রমা বললে, তোমার মাথা খারাপ। এমন অসম্ভব জিনিস বিশ্বাস করলে কেমন করে ?

যে জিনিসটা মনের দিক থেকে অবিশ্বাস করতে পারলেই বেঁচে যেতো শঙ্কর, ঠিক সেই কথাটা রমার মুখে শোনামাত্র একটা ক্ষিপ্র প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল তার ভেতরে। ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল চৌধুরী বংশের আভিজাত্য—প্রতিবাদ অসহিষ্ণুতা ; বিশেষ করে স্ত্রীলোকের প্রতিবাদ।

মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল শঙ্করের. বিতৃষ্ণ বিকট হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর : তুমি চুপ করো।

—চুপ করব ? কেন ? তুমি কি পাগল ?

—যা জানোনা তা নিয়ে তর্ক করতে এসোনা। বিশ্বাস আছে ওদের ? হয়তো এসে ঘুমের মধ্যে ঘ্যাঁচ করে ছোরা বসিয়ে দেবে।

—কিন্তু

—আর বাজে বোকোনা—নিজের কাজে যাও—

কথাটা বলে দুম দুম করে শঙ্কর নিজেই সরে গেল, আর পাংশু বিশীর্ণ মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রমা।

একটা পাশার আড্ডা আছে গ্রামে। সন্ধ্যার দিকে শঙ্কর রোজ যায় সেখানে, ফিরতে দশটা সাড়ে দশটা বাজে। আপাতত পাশা খেলা বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে লাঠি খেলা শেখানো হচ্ছে।

পাশার ভেতরে তবু নিজেকে ভুলে থাকবার একটা উপায় ছিল, কিন্তু সে পথ এখন বন্ধ। আর ভালো লাগে না, সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। ঘরশত্রু বিভীষণের আশঙ্কাটা একটা ক্ষয় রোগের মতো দিনের পর দিন যেন কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। রাত্রে ঘুম আসে না, উত্তেজনায় আর অস্বস্তিতে যেন তার শিরাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়তে থাকে। কিছু একটা করা দরকার, উস্তাদজী সম্পর্কে কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু কী করা সম্ভব ?

বিদায় করে দেবে বাড়ি থেকে ? না, সেও অসম্ভব। পনেরো বছর আগে যে গৌরবে মেহেরা খাঁ এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন আজ তাঁকে সেই গৌরব থেকে অপসারিত করা অসাধ্য শঙ্করের পক্ষে। শ্রদ্ধা না করুক—ভয় করে তাঁকে, তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে অত্যন্ত ছোট মনে হয় নিজেকে। তাঁর সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা কিছু তাঁকে বলবে এতবড় স্পর্ধা নেই তার।

ভারি ক্লান্তি লাগছে, অসহ্য একটা অস্বস্তির পীড়নে জ্বলে যাচ্ছে শরীর, পুড়ে যাচ্ছে মন। আজ তাই অসময়ে, সন্ধ্যার পরেই বাড়ির দিকে ফিরছিল শঙ্কর।

কিন্তু দেউড়ির কাছাকাছি আসতেই উৎকর্ণ একটা কুকুরের মতো থমকে দাঁড়ালো শঙ্কর—যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় তার আসন্ন কিছু একটার সংকেত পেয়েছে। উস্তাদজীর ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু সেখানে কারা ফিসফিস করে কথা বলছে না ? হ্যাঁ—ঠিক, কোনো ভুল নেই।

শঙ্করের সমস্ত শরীর যেন পাথর হয়ে গেল, বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল হৃৎপিণ্ড, চোখে মুখে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল রক্তের কণা। আর ভুল নেই।

এগিয়ে এসে শঙ্কর কঠিনভাবে ঘা দিলে দরজায় : উস্তাদজী, উস্তাদজী !

এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তার পরেই ঘরের ভেতরে টের পাওয়া গেল একটা অস্পষ্ট চঞ্চলতার শব্দ। তার পরেই পেছন দিকের দরজা খুলে কেন যেন ছুটে বেরিয়ে গেল।

শঙ্কর ঘুরে গিয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই সে যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হিংস্র বাঘের মতো মুখ করে উস্তাদজীর ঘরে ঢুকল শঙ্কর।

ঘরে আলো জ্বলছে। বিছানার ওপরে বসে আছেন উস্তাদজী।

তাঁর চোখে মুখে শঙ্কার ছাপ। কোলের ওপর পড়ে আছে সেতারটা।

শঙ্কর কঠোর স্বরে বললে, ঘরে কে এসেছিল উস্তাদজী?

উস্তাদজীর ঠোঁট দুটো একবার কেঁপে উঠল।

—কে এসেছিল?

—আমি বলতে পারব না।

ঘৃণায় আর ক্রোধে কুটিল হয়ে উঠল শঙ্করের মুখ: আমি জানতে চাই।

আবহাওটা লঘু করবার চেষ্টা করলেন উস্তাদজী, ম্লানভাবে হাসলেন একটুখানি: তোমার বাপকে আমি হুকুম করতাম আর তুমি কিনা আমাকে হুকুম করতে চাও?

বীভৎস গলায় শঙ্কর বললে, চালাকি চলবে না। বলতে হবে আপনাকে।

উস্তাদজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমি সত্যবদ্ধ—বলতে পারব না। আর তা ছাড়া সে জেনে তোমার কোনো দরকার নেই। নিজের কাজে যাও বেটা।

শঙ্কর বললে, বলতে হবে না, আমি বুঝেছি। দুধ দিয়ে বাবা কাল সাপ পুষেছিলেন। আমার ঘরে বসে আপনি আমারই সর্বনাশ করতে চাইছেন।

তীরের মতো সোজা হয়ে উস্তাদজী দাঁড়িয়ে উঠলেন: বেওকুফ, বেতমিজ, কী বলছ তুমি!

—বলছি আপনি বেইমান। আমার বাড়িতে বেইমানের জায়গা নেই।

বেইমান! উস্তাদজীর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন সরে গেল, সাদা হয়ে গেল কাগজের টুকরোর মতো। সিংহের মতো চীৎকার করে উঠলেন তিনি: চোপরাও বেতমিজ।

শঙ্কর পাথরের মতো শক্ত স্বরে বললে, আমি চুপ করব, কিন্তু আজই আপনাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে ওস্তাদজী।

ক্রোধে অপমানে উস্তাদজী থর থর করে কাঁপতে লাগলেন : তুমি তুমি আমাকে এমন কথা বললে!

শঙ্কর বললে, বললাম। আপনি বিশ্বাসঘাতক, আপনি বেইমান!

উস্তাদজী বসে পড়লেন। একটা কথা বললেন না, চাইলেন না একটা কৈফিয়ৎ। তারপরের দিন সকালে আর তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না। চল্লিশ বছর আগে আশিক বাঈ যাঁকে দেওয়ানা করে দিয়েছিল, চল্লিশ বছর পরে আবার তিনি 'ই দেওয়ানা দুনিয়ামে' বেরিয়ে পড়লেন বার্ধক্য শিথিল, ক্লান্ত পদক্ষেপে।

কিন্তু দিওয়ানা হতে চাইলেই কি হওয়া যায়? এতদিন পরে কখন যে নিবিড় হয়ে মনের ভেতরে ফাঁস পড়ে গেছে উস্তাদ মেহেরা খাঁ তা কি ভাবতেও পেরেছিলেন? যাকে তিনি ভেবেছিলেন মুম্বইয়ের নীল সমুদ্রে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে তা আবার এমনভাবে ফিরে এল কী করে?

'যো দিন যাওয়ি বাহুড়ি সো আওয়ি।'

যেদিন যায় সে আবার ফিরে আসে। আবার নতুন করে মনের কাছে ফিরে এসেছে আশিক বাঈ। সব রাগ-রাগিণীর পাঠ তাকে তিনি দিতে চেয়েছিলেন, শুধু দিতে পারেননি টোড়ী। ব্যথা ছিল, বেদনা ছিল, ছিল নিজের ভেতরে নিভৃত দুঃখ-সম্ভোগের মোহ। কিন্তু আর সে মোহ নেই, সে দুঃখের অবসান হয়ে গেছে। যাকে তিনি সব ধরে দিলেন, আজ তাকে তাঁর শেষ অর্ঘ, তাঁর টোড়ী তুলে না দেওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই দেওয়ানা ফকিরের।

বৃষ্টি পড়ছে দাঙ্গা-কলঙ্কিত কলকাতায়—নেমেছে শোকের মতো

শ্রাবণের রাত্রি। তানপুরা কাঁধে পথে পথে ঘুরছেন উস্তাদজী। পা টলছে, চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। তিনদিন খাওয়া হয়নি। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, ক্লান্তিতে শরীর যেন লুটিয়ে পড়ছে তাঁর। এ নরোত্তমপুর নয়, নবাবী আমলের বাগ্-বাগিচা আমদরবারের শহর দিল্লী নয়। এ কলকাতা—আধুনিক, উদ্ধত। এখানে উস্তাদজী কোথায় খুঁজে পাবেন তাঁর আশিক বাঈকে—কেমন করে তার হাতে তুলে দেবেন তাঁর শেষ অর্ঘ ?

নির্জন পথ—অন্ধকার। হঠাৎ দুদিক থেকে দুজন গুণ্ডা চেহারার লোক এসে তার হাত ধরল !

—এই মিঞা সাহেব, যাবে কোথায় ?

অদ্ভুত আবিষ্ট চোখে উস্তাদজী তাকালেন।

—বলতে পারো ভাই, এখানে শঙ্কর চৌধুরীর বাড়ি কোথায় ?

—শঙ্কর চৌধুরীর বাড়ি ?—লোক দুটো হিংস্র জন্তুর মতো হেসে উঠল শব্দ করে : খুব কাছেই। পাশের এই অন্ধকার কানা গলিটার ভেতরে। সদর রাস্তাতেই পৌঁছে দিতে পারলাম, কিন্তু কানা গলিই সুবিধে—শর্ট কাট্। চলে এসো।

নির্জন পথ। শ্রাবণের অশ্রুধারার মতো অশ্রান্ত বৃষ্টি। উস্তাদ মেহেরা খাঁর শেষ অর্ঘ আর পৌঁছুল না। কিন্তু বেশিদিন লুকোচুরি তো চলবে না শঙ্করের কাছে। একদিন বুঝতে পারবে শঙ্কর—একদিন জানতে পারবে টোড়ী রাগিণীর পাঠ শেষ না করেও কত ভালো সেতার শিখেছে রমা। নিভৃত অন্ধকার ঘরে তার সেই একনিষ্ঠ সাধনা, তার গুরুর আশীর্বাদ সার্থক হয়েছে।

কালা বদর

উত্তরে বলে মেঘনা। তারও উত্তরে ব্রহ্মপুত্র, আরও উত্তরে যেখানে হিমালয়ের বুকের ভেতর থেকে ফেনায় ফেনায় গর্জে বেরিয়ে আসছে সেখানকার ইতিহাস কেউ বলতে পারে না।

মেঘের মতো জলের রঙ বলে নদীর নাম দিয়েছিল মেঘনা। এখানে এসে সে নাম হল কালাবদর। শুধু মেঘবরণ জল নয়, অদূর সমুদ্রের ঘন-নীলিমাও যেন এর ভেতরে এসে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। দিনে রাতে দুবার মাত্‌লা হাতীর ঝাঁকের মতো ছুটে আসে জোয়ারের জল —এদেশে বলে 'শর' এল। সে তো আসা নয়, বলতে হয় আবির্ভাব। পাহাড়-প্রমাণ উঁচু হয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসে ক্ষ্যাপা জলোল্লাস, রাশি রাশি রাশি মল্লিকা ফুলের মালার মতো ফেনার ঝালর দুলতে থাকে তার সর্বাঙ্গে, জলকণার একটা ছোট 'কুয়াশা' ঘুরতে থাকে তার মাথার ওপর আর দুদিকের তটের গায়ে প্রবল শব্দে আছড়ে পড়ে তার পাশব-মত্ততা। একখানা ছোট নৌকোও যদি তখন কূলে বাঁধা থাকে, মুহূর্তে হাজারখানা হয়ে কুটোর মতো মিলিয়ে যায়, কখনো আর তার সন্ধান মেলে না।

কালাবদর। পাঁচ পীর বদর বদর করে পাড়ি ধরে মাঝিরা। উৎসুক আকুল চোখে আকাশটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা একফালি সোনামুখী মেঘ। বিশ্বাস নেই এই সর্বনাশা নদীকে। মেঘ দেখলেই কালো ময়ূরের মতো আনন্দে পেখম মেলে দেয়, নাচতে সুরু করে ভৈরবী উল্লাসে। তখন ছোট নৌকো তো দূরের কথা, জাহাজে পর্যন্ত সামাল্ সামাল্ ওঠে।

বিশাল ভয়ঙ্কর নদী কালাবদর। কাল্-কেউটের মতো তার জলের রঙ—তার গর্জনে কোটি কোটি বিষাক্ত কেউটের ফোঁস্-ফোঁসানি। ঝড় ওঠে, নৌকো ডোবে, মানুষ মরে। শরের ঘা লেগে উঁচু ডাঙাশুদ্ধ নারকেল-সুপুরির গাছ ভেঙে পড়ে করাল স্রোতে। কালীদহ ছেড়ে কালীয়নাগ কালাবদরে এসে বাসা বেঁধেছে।

আলাইপুরের খালটা যেখানে মানুষের প্রসারিত একটা মুঠির মতো হঠাৎ চওড়া হয়ে কালাবদরে এসে পড়েছে, ওই খানেই 'কেরায়া' নৌকোগুলোর আড্ডা। পাগলা শরের ভয়ে মাঝিরা পারৎপক্ষে নৌকো নদীর ওপরে রাখে না, খালের এই মুখটুকুর ভেতরে ঢুকেই লগি পোঁতে। বিশ্বাস নেই কালাবদরকে। হয়তো একটুখানি বাজার করতে গেছে, কিংবা সংগ্রহ করতে গেছে দুটো একটা মাছ— এমন সময় এল নদীর মাতলামি, ফিরে এসে মাঝি দেখলে নৌকো তো দূরের কথা, তার কাছিটির চিহ্ন অবধি নেই। খাল এদিক থেকে নিরাপদ। জলের ঝাপটা ভেতরে যতটুকু আসে তা নৌকোকে একটুখানি নাগর দোলায় দুলিয়ে যায় মাত্র, তার বেশি আর কিছুই করে না।

খালে আজ বেশি নৌকো ছিল না। কফিলদ্দি মাঝি সবে পেঁয়াজ-কলি দিয়ে ইলিশ-মাছের ঝোলটা চাপিয়ে দিয়েছে, এমন সময় এল সোয়ারী।

—ও মাঝি ভাই, কেরায়া যাবা?

—যাইবেন কই?

—জাউলা!

—জাউলা? জাউলার হাট?

—হ।

—কন্ কী ? হারা (সারা) রাত্তির পাড়ি দেওনের কাম।

—করমু কি কও ? বিয়া আছে, যাইতেই অইবে।

—হুঃ বুঝছি।

এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে অভ্যস্ত রীতিতে কথা বলছিল কফিলদ্দি, হুঁকোয় অল্প অল্প টান দিচ্ছিল নিরাসক্তভাবে। এইবার ধীরে সুস্থে মুখ থেকে হুঁকোটা নামালে, কল্কের আগুনটা ঝেড়ে দিলে খালের ঘোলা জলে। জলস্রোতের মধ্যে ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে পোড়া টিকের টুকরোগুলো পড়তে লাগল, কালো ছাইয়ের একটা সরল রেখা লগিটার চারদিকে পাক খেয়ে তীব্র বেগে নদীর দিকে চলে গেল।

—ক্যারায়া দিবেন কত ?

—বুঝিয়া-সুজিয়া লও ভাই, তোমাগো আর কমু কি ?

—তমো কয়েন ? (তবু বলুন ?)

—পাউচ্‌গা টাহা দিমু (পাঁচটা টাকা দেব)—এয়ার বেশি না।

—হেইলে হাতর দিয়ে যায়েন (তা হলে সাঁতার দিয়া যান) নায়ে চড়নের কাম নাই। এটাও অভ্যস্ত জবাব। কিন্তু এ অভ্যাস বেশিদিনের নয়, যুদ্ধ বাধবার পর থেকে। আগে মাঝিরাই সোয়ারীর তোয়াজ করত, চার আনা ভাড়া বেশি দেওয়ার জন্যে আল্লার দোহাই পাড়ত, দুহাত জোড় করে বলত : আইচ্ছা, আইচ্ছা, বেশি না দ্যান, কুদ্ ঘাটের (সরকারী কর-সংগ্রহের ঘাট) পয়সা আর এক ব্যালার জলপান দিবেন।

কোথায় গেল সে সব। আশ্চর্যভাবে ঘুরল পৃথিবীর চাকা—সময়ের চাকা। যুদ্ধ গেল, মন্বন্তর গেল। মরল হাজারে হাজারে মানুষ। কালাবদরের কালো জলে যারা ডুবে মরে, তারপর ভেসে ওঠে প্রকাণ্ড

একটা জয়ঢাকের মতো, তাদের মতো করে নয়। বরং শুকিয়ে মরল, এতবেশি শুকিয়ে মরল যে ফুলবার মতো শরীরে আর কিছু রইল না, শুকনো হাড়ের থেকে চিম্সে চামড়া গলে গলে মিলিয়ে গেল মাটিতে। হাড়ের ওপরে ঠোকা মেরে ঠোঁট ঘুরিয়ে অবজ্ঞায় উড়ে চলে গেল শকুনের পাল। আর পৃথিবী বদলালো। যারা বাঁচল, তাদের একটাকা কেরায়া উঠল পাঁচ টাকায়, তাদের মেজাজ হল হাজার-বিঘে ধানী-জমির মালিক তালুকদারদের মতো। সুতরাং হুঁকো নামিয়ে নিবিষ্টভাবে আবার ঝোলের কড়াইয়ের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে কফিলদ্দি।

—লও, আর আষ্ট আনা দিমু, হোন্ছো (শুনছো)? কথা কও না দেহি?

—কমু আর কি? পাঁচ-ছয় টাহার কাম না কত্তা—দউশগার কোমে কথা নাই।

—ওরেঃ, ডাহাইত (ডাকাত)! মাথায় বাড়ি দিতে চাওনি?

অবজ্ঞাভরে খালের জলে থুথু ফেললে কফিলদ্দি: চাউলের মোন. হইছে কুড়ি টাহা—হেয়া ভ্যাহেন না?

—লও ভাই, আর অ্যাট্টা (একটা) টাহা ধর। আর বগড় বগড় দিয়া কাম নাই।

এতক্ষণে যেন চমক ভাঙল কফিলদ্দির। এতক্ষণে সে এদের দিকে তাকালো। মধ্যবয়সী একটি পুরুষ, গায়ে ময়লা একটা ছিটের সার্ট, পায়ে এক জোড়া মলিন জুতো। রোগা চেহারা, গলার হাড়টা থুতনীর নীচ দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। হাতে একটা ছোট পুঁটলী। তার পেছনে ঘোমটা দেওয়া একটি বউ, একখানি ডুরে শাড়ীর নীচে তার রোগা রোগা দুখানি পা দেখা যাচ্ছে। মুখখানি ঘোমটায় ঢাকা—কিন্তু পায়ের দিকে তাকিয়েই কফিলদ্দি বুঝতে

পেয়েছে ওই মেয়েটির মুখে পুরুষটির মতোই ক্লান্তির কালো ছাপ আঁকা রয়েছে। মধ্যবিত্তের পরিচিত ক্লান্তি আর অবসন্নতা।

শেষ পর্যন্ত রফা হল সাত টাকায়।

আলাইপুরা থেকে জাউলার হাট কোনাকুনি পাড়ি, প্রায় বারো মাইল পথ। মাঝখানে হাসান্দির-আধ-জাগা লম্বা চড়াটা ছাড়া আর ডাঙা নেই কোনোখানে। রাত্রির ছায়ায় কালাবদরের কালো জল হয়ে গেল নিকষ কালো, তারপর কখন এক ফালি মেঘ এসে চিকচিকে তারাগুলোর ওপর দিয়ে ঘন একটা পর্দা টেনে দিয়ে গেল।

তখন ঝির ঝির করে বাতাস বইছিল নদীতে। আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল বাতাসের বেগ। কালাবদরের কালো ঢেউয়ের মাতন শুরু হয়ে গেল। অন্ধকার জলের ওপরে উজলে উজলে উঠতে লাগল ফেনার রাশি। একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে নৌকোটা প্রবল বেগে আর একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বিরক্ত ভ্রূকুটি ফুটে উঠল কফিলদ্দির কপালে। কালাবদরের এমন মাতামাতি কিছু অস্বাভাবিক নয়। তার এক-কাঠের শাল্‌তি ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ঘোড়ার মতো জোর কদমে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে চলে যাবে তাও সে জানে। হাজার ঝাপটা লাগলেও তার নৌকোর তলার জোড় খুলবে না। কিন্তু ছুটন্ত তেজীয়ান ঘোড়াকে যেমন রাশ টেনে সামলে সামলে রাখতে হয়, তেমনি তাকেও আজ সারারাত নৌকো সামলাতে হবে। পালের মুখে ছেড়ে দিয়ে গলুইয়ের ওপরে একটুখানি কাত হয়ে নেবার আশা আজ বিড়ম্বনা, নদী আজ সারারাত ভোগাবে বলে বোধ হচ্ছে।

চারদিকে জলের গর্জন উঠছে। আকাশে জোরালো মেঘ নেই, মাঝে মাঝে পাতলা পর্দাটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়ে উঁকি দিচ্ছে তারা। কিন্তু বাতাসের বিরাম নেই—ঢেউ উঠছে সমানভাবে। হাতের

পেশীগুলোকে দৃঢ় করে কফিলদ্দি নৌকোটাকে আর একটা বড় ঢেউয়ের ওপর দিয়ে বার করে নিয়ে গেল।

ভেতরে স্বামী-স্ত্রী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠল তারা।

—ও মাঝি ভাই, মাঝি ভাই ?—পুরুষটির গলা।

জলের দিকে স্থির চোখ রেখে কফিলদ্দি বললে, কী কন, কন কী ?

—গাং দেহি ক্যামন ক্যামন ঠ্যাকে। কাইতান (কার্তিকী তুফান) ওঠল নাকি ?

চিন্তিত স্বরে কফিলদ্দি বললে, মনে তো লয়।

—খাইছে ? পুরুষটির স্বরে ভয়ার্ত কাতরতা ফুটে বেরুল : নাও কোন্হানে (খানে) ?

—মধ্য গাঙে (মাঝ নদীতে) ;

—হাসাস্দির চর ?

—ঠাহোর পাইতে আছি না।

—এ্যাহোন করন কি ?—কফিলদ্দি মেয়েটির একটা অস্ফুট আর্তনাদও যেন শুনতে পেল।

—ডরাইবেন না, চুপ মারিয়া শুইয়া থাহেন। আমার নাও ডোববেনা।

—কইবে কেডা ? যে রাইক্কোসা (রাক্ষুসে) গাঙ—মানুষ খাওনের লইগ্যা জেব্বা (জিহ্বা) বাড়াইয়া রইছে।

—নাও ফালাইতে (ডোবাতে) এয়ার আর দোসর নাই।

মেয়েটির আর্তনাদ এবার স্পষ্টই শুনতে পেল কফিলদ্দি। আর সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা বিশ্রী বিরক্তিতে তার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। রূঢ় গলায় বললে, ফ্যাগড়া প্যাচাল পাড়েন ক্যান্ কত্তা ?

(বাজে বক্‌ছেন কেন?) চুপ মারিয়া শুইয়া থাহেন কইলাম। আমার নাও গেলনের আগে নদীরে পীরের ছিন্নি খাইয়া আইথে লাগবে। (আমার নৌকো গিলবার আগে নদীকে পীরের সিন্নি খেয়ে আসতে হবে।)

—বাচাইলে তুমি বাচাইবা, মরলে তোমার হাতেই মরুম—পুরুষটি মৃঢ় অসহায় গলায় জবাব দিলে।

—মরণের অ্যাহোন হইছে কি? খামাকৃখা (খামোকা) হাবিজাবি কইয়া মাঠারইনরে ডরাইতে আছেন, চোপাহান (মুখখানা) একটু ক্ষ্যামা দিয়া থোয়ন।

চুপ করে গেল পুরুষটি। কফিলদ্দির কণ্ঠস্বরের রূঢ়তাটা তাকে নিরুৎসাহ করে দিয়েছে। বিপদে পড়লে খানিকটা প্রগল্‌ভ হয়ে উটে মানুষ, কথার ভেতর দিয়ে মনের থেকে নামিয়ে দিতে চায় পুঞ্জিত ভয়ের বোঝাটা। কিন্তু সে অবস্থা নয় কফিলদ্দির। হাতের পেশীকে লোহার মতো শক্ত করে যখন ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতো উচ্ছৃঙ্খল ঢেউকে একটার পর একটা টপকে যেতে হচ্ছে, যখন চোখের দৃষ্টিকে রাত্রিচর পাখীর মতো তীক্ষ্ণ তীব্র করে রাখতে হচ্ছে নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা চক্রবালের দিকে এবং যখন জানা আছে কালাবদরের এই মাঝ গাঙে দুশো হাত লগিরও থই মিলবে না, তখন উৎসাহের অভাবটা কফিলদ্দির তরফ থেকে একান্ত স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

আকাশে হাল্‌কা হাল্‌কা মেঘ বটে, কিন্তু এককোণে পেটা লোহার একটুকরো পাতের মতো খানিকটা ঘন কৃষ্ণতা লেপ্‌টে আছে আকাশের গায়ে। ঝড়াং ঝড়াং করে লাল-বিদ্যুতের এক একটা শিখা সেখানে কতগুলো আগ্নেয় বাহু এদিক ওদিক বাড়িয়ে দিয়েই ফিরে যাচ্ছে আবার। কালাবদরের কালো জলটা অদ্ভুতভাবে কুটিল হয়ে উঠছে সে আলোয়, যেন জলের তলা থেকে একটা অতিকায়

অক্টোপাশ তার রক্তাক্ত বহুভুজগুলি নিয়ে মুহূর্তের জন্যে ভেসে উঠেই আবার হারিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর গভীর অতলতায়। আর ওদিকে মাঝে মাঝে শঙ্কিত ভাবে তাকাচ্ছে কফিলদ্দি। ওই ইস্পাতের পাতটা যদি ক্রমশ নিজেকে ছড়াতে আরম্ভ করে, যদি এক সময় একটা দমকা হাওয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলে সমস্ত আকাশটাকে, তাহলে—তাহলে—

পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল কফিলদ্দির। পাকা মাঝি, কালা-বদরের কালো জলের সঙ্গে তার পরিচয় সুদীর্ঘ এবং ঘনিষ্ঠ। আর এই কারণেই নদীকে তার বিশ্বাস নেই। উন্মাদ কালাবদরের কাছে বড় বড় জাহাজও যা, এক মাল্লাই সাল্‌তিরও সেই একই অবস্থা।

ঢেউয়ের বেগটা প্রবল হচ্ছে ক্রমশ—বাতাস এখন চোখে-মুখে যেন ঝাপটার মতো ঘা দিতে শুরু করেছে। লাল বিদ্যুতের আকস্মিক উদ্ভাসে সামনে যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধু ঢেউয়ের ফেনা উপচে উপচে পড়ছে। ভূতগ্রস্ত মানুষ যেমন বিশৃঙ্খলভাবে মাতামাতি করতে থাকে, গাঁজ্‌লা ভাঙে তার মুখ দিয়ে, তেম্‌নি অসম্বৃত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে নদী, তেম্‌নি করে ফেনা গড়াচ্ছে তার লক্ষ লক্ষ মুখে। কালাবদরকে ভূতে পেয়েছে।

কালাবদরকে ভূতে পেয়েছে। হৃদপিণ্ড থেকে এক ঝলক রক্ত যেন উছ্‌লে উঠে কফিলদ্দির মাথার মধ্যে গিয়ে পড়ল। বৈঠাতে প্রবলভাবে টান দিলে সে, নৌকোটা আকস্মিক ভাবে যেন মস্ত একটা লাফ দিয়ে হাত তিনেক এগিয়ে গেল। নৌকোর ভেতরে ভয়ার্ত যাত্রী দুজন প্রায় হাহাকার করে উঠল।

—কী হৈল, ও মাঝি ভাই, হৈল কী ?

—চুপ করেন কইলাম না ?—কফিলদ্দি গর্জে উঠল : অ্যাকালে চুপ !

যাত্রীরা চুপ করল। কোনো উপায় নেই, কিছু বলবার নেই। অসহায়, বিব্রত, মাঝির করুণার কাছে একান্তভাবেই আত্ম-সমর্পিত। কফিলদ্দি ইচ্ছা করলে ওদের খুন করতে পারে, রাত্রির অন্ধকারে পুঁতে দিতে পারে কালাবদরের যে কোনো একটা বালুচরের হোগলা-বনের মধ্যে, কেউ টের পাবেনা, একটা রক্তের বিন্দু দূরে থাক, এক টুকরো হাড়ও খুঁজে পাবেনা কোনোদিন। নইলে একটা পাক দিয়ে চোখের পলকে ডুবিয়ে দিতে পারে নৌকো—মুহূর্তে তলিয়ে দিতে পারে ক্ষিপ্ত কালোজলের ভেতরে। কালাবদরের মাঝি—ওর আর কী, কিছুতেই ডুববেনা, একটা খড়ের আঁটির মতো অবলীলাক্রমে ভাসতে ভাসতে ডাঙায় গিয়ে পৌঁছবেই শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু কফিলদ্দির আত্মবিশ্বাস নেই অতটা। কালাবদরকে সে চেনে, কালাবদরকে সে বিশ্বাস করে না। ঠিক কথা—এ সাধারণ নদী নয়, এ ভূতুড়ে। এর জলের ভেতরে শয়তান লুকিয়ে আছে, এর ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাজার হাজার প্রেতাত্মা নেচে বেড়ায়। কত মানুষ যে এই নদীতে ডুবে মরেছে তার কি হিসেব আছে কিছু? এর অদৃশ্য অতলতায় বালির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে শ্যাওলা-ধরা অসংখ্য কঙ্কাল, অসংখ্য নরমুণ্ডের শূন্য খোলের ভেতরে ডিম পাড়ছে গভীরচারী পাঙাস-মাছের দল, ডোবা নৌকোর পচা-ভাঙা কাঠের ভেতরে কিলবিল করে বেড়ায় রাক্ষুসে কামটের ছানা। আর, আর আছে প্রেতাত্মা। দুর্যোগের রাত্রে, ঝড়ের রাত্রে তারা উঠে আসে, উদ্দাম জলের দোলায় দোলায় তাণ্ডব নাচে, অসহায় মানুষ পেলেই হিমশীতল কঙ্কাল বাহু বাড়িয়ে টেনে নেয় তাদের। সত্য, নোনা-কাটা চরের হোগলা আর শোন-ঘাসের বনে ডাকাতের হাতে অপঘাতে যারা প্রাণ দিয়েছে, জলের গর্জনে গর্জনে তাদেরও বিকট অট্টহাসি বেজে ওঠে, তারাও—

গজরাচ্ছে কালাবদর, মেতে উঠেছে ফেনায় ফেনায়। লোহার চ্যাপ্টা পাতটার ভেতরে বজ্র ঝলকাচ্ছে, জলের মধ্যে লিক্ লিক্ করে উঠছে রক্তাক্ত অক্টোপাস। কফিলদ্দির সারা গা গিয়ে ঘাম ছুটতে লাগল। নৌকো এগোচ্ছে না—প্রতিকূল জল ক্রমাগত বাধা দিচ্ছে, ক্রমাগত প্রেতাত্মাদের কঙ্কাল হাতগুলো যেন তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, কোথাও যেন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে কেউ। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মাথায় কী চিক চিক করছে, যেন সেই তাদের চোখ, সেই যারা—

—পাঁচ পীর বদর বদর—

হঠাৎ আর্তনাদের মতো শব্দ করে বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল কফিলদ্দি। তার ভয় করছে, ভয় ধরেছে তার। জলের ভয় নয়, এই সব প্রেতাত্মাদের ভয়। মাঝে মাঝে এই রকম এক একটা আকস্মিক ভয়ে কালাবদরের মাঝিদেরও মন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু কফিলদ্দি জানে এ খারাপ লক্ষণ, ভারী খারাপ লক্ষণ। দুর্যোগের রাত্রে যখন মরণ ঘনিয়ে আসে, তখনি এই ধরণের ভয় পায় মাঝিরা। কেউ ডুবে. মরে, কেউ পাগল হয়ে যায়, কারো কারো জবাফুলের মতো রাঙা চোখ দুটোর ভেতর দিয়ে যেন রক্ত ফেটে পড়বার উপক্রম করে—মুখ দিয়ে এম্‌নি করেই ফেনা গড়াতে থাকে!

—লা ইল্লাহা, রসুলাল্লা—

না, না, এ ভয় চলবেনা কফিলদ্দির। এ ইচ্ছে করে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষে ভয় পেলেই তার দুর্বল স্নায়ুর ওপরে ইব্‌লিশ তার প্রভাব বিস্তার করে, মানুষের অসতর্কতার সুযোগ নেবার জন্যেই তৈরী হয়ে থাকে জিন-পরী-প্রেতাত্মার দল। চোখ বুজে আবার প্রবল বেগে দাঁড়ে টান দিলে কফিলদ্দি। এ অন্ধকারে চোখ বুজে আর চোখ চেয়ে থাকা একই কথা।

নৌকোর পুরুষ যাত্রীটি আবার স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে।

—ও মাঝি ভাই, হোন্‌ছো নি ?

—কী কইথে আছেন ?

—নায়ের পাল উডাইয়া ছাও না ? বায়ে (বাতাসে) লইয়া যাউক।

—হ, এতক্ষুণে অ্যাট্টা পণ্ডিতের মতো কথা কইছেন !—অত্যন্ত তিক্ত শোনালো কফিলদ্দির স্বর।

অপরাধীর গলায় পুরুষটি আবার বললে, ক্যান. অনেয্য কইছি নাকি ? জোর কাইতান মারতে আছে, নাও ডুবাইয়া দে (ডুবিয়ে দেয়) কিনা বোঝতে আছি না। হেয়ার থিয়া (তার চেয়ে) বায়ে যেদিক লইয়া যায়—

—যা বোঝেন না, হেয়ার উপার কথা কইয়েন না কত্তা। ছাখতে আছেন না গাঙের চেহারাডা ? বায়ে যদি স্মুদ্দুরে টানিয়া লইয়া যায়, হ্যাশে (শেষে) কী হরবেন (করবেন) ? লোনা স্মুদ্দুরে ডুবিয়া মরণের সাধ হইছে নি ?

তা বটে। এ যুক্তি নির্ভুল। কালাবদরের বুকে ক্ষ্যাপা বাতাস ক্রমশ ঝড়ের রূপ নিচ্ছে। এই ঝড়ের মুখে পাল তুলে দিলে দেখতে দেখতে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে কে জানে ? সমুদ্রে না হোক অন্তত তার মোহানার মুখে নিয়ে গিয়েও যদি ফেলে দেয়, তা হলে আর আশা নেই। কালাবদর যদি বা ক্ষমা করতে রাজী থাকে, কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপুল সমুদ্রের ক্ষমা নেই ; কালাবদরের চাইতেও ঢের বেশি নিবিড় তার কালো রঙ, তার জলের মাতামাতি আরো উদ্দাম। কালাবদরে তবু কূল মিলতে পারে, কিন্তু সমুদ্র অকূল, আদি অন্তহীন।

—হেইলে উপায় ?

—খোদা ভরসা।

খোদা ভরসা। তাই বটে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরুষটি চুপ করে গেল। আর জলের ক্ষিপ্ত কলধ্বনির মধ্যেও কফিলদ্দি শুনতে পেল মেয়েটির চাপা কান্নার শব্দ। ওরা ভয় পেয়েছে, অত্যন্ত পেয়েছে।

জলের সঙ্গে লড়াই করতে করতে হাতের পেশীগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে কফিলদ্দির। দাঁতের ওপরে দাঁত চেপে বসেছে, শরীরের সর্বাঙ্গে বয়ে যাচ্ছে ঘামের স্রোত। এতদিনের পরিচিত অভ্যস্ত নৌকোটাও যেন আজ বাগ মানছে না। কী কুক্ষণেই আজ সে কেরায়া ধরেছিল।

হু হু হু হু। বাতাসের অশ্রান্ত আর্তনাদ। অন্ধকার জলের ওপরে থেকে থেকে রক্তাক্ত চমকানি। উঃ, বাতাসটা কি আজ আর কিছুতেই থামবেনা। চারদিকে প্রেতাত্মাদের গোঙরানি চলেছে সমানে, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় তেমনি চিক চিক করে ঝিমিয়ে উঠছে কাদের বিষাক্ত কুটিল চোখ, ফেনাগুলো উছলে উছলে পড়ছে চারদিকে—যেন কাদের পৈশাচিক কঙ্কাল মুষ্টিগুলো ওদের নিষ্পিষ্ট করবার জন্যে বারে বারে খুলছে আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অপরিসীম ভয়ে আবার চোখ মুদে ফেলল কফিলদ্দি, শক্ত করে চেপে ধরলে চোখের পাতা দুটো—জলের দিকে আর সে তাকাতে পারছেনা।

কফিলদ্দি ভয় পেয়েছে, ওদের চাইতেও বেশি ভয় পেয়েছে! নদীর ভয়? না। তার চাইতেই ভয়ানক—পিশাচের ভয়, অপদেবতার ভয়। এর চাইতেও অনেক কঠিন দুর্যোগের ভেতরে তার সাল্‌তি নির্ভয়ে পথ কেটে এগিয়ে গিয়েছে, মৃত্যুর রাক্ষসরূপ কালাবদর তাকে দেখিয়েছে অনেক বার। কিন্তু পাকা মাঝির বুক তাতে এমন করে আতঙ্কে ভরে যায়নি, এমন করে তার স্নায়ুকে শিথিল, নিস্তেজ করে

দিতে পারেনি। বরং দুলে উঠেছে রক্ত—কলিজার ভেতরে বয়ে গেছে উত্তেজনার উত্তপ্ত জোয়ার। দাঙ্গার সময় বিরুদ্ধ দলের মধ্যে লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে শিরায় শিরায় রক্ত যেমন টগবগ করে ফুটতে থাকে, তেমনি একটা কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকল্পে সতেজ আর সজাগ হয়ে উঠেছে চেতনা। কিন্তু আজ এমন হল কেন? যেন মনে হচ্ছে আজ তার নদীর সঙ্গে সংগ্রাম নয়—এ যুদ্ধ কতকগুলো ভয়ঙ্কর অশরীরীর সঙ্গে, কতগুলো অপঘাতে মরা হিংস্র প্রেতাত্মার সঙ্গে? কেন হল? এমন কেন হল?

বৈঠা ছেড়ে দাঁড় ধরেছে কফিলদ্দি। তেমনি চোখ বুজে দাঁড় টেনে চলেছে—শরীরের সমস্ত শক্তিকে সঞ্চারিত করে নিয়েছে দুটো বাহুর মধ্যে। টানের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা গলুয়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ছে নীচের দিকে—বুকের ভেতরে কী যেন চড় চড় করে উঠছে, হৃৎপিণ্ডটা হটাৎ তার ছিঁড়ে যাবে নাকি?

কেন এমন হল? কেন? সেওকি আজ পাগল হয়ে যাবে? তার চোখ দিয়ে অমনি করে ফেটে পড়বে রক্ত? আধহাত জিভ বার করে দিয়ে সেও হাঁপাবে একটা ক্লান্ত কুকুরের মতো আর থেকে থেকে আকাশ ফাটানো এক একটা অর্থহীন ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে উঠবে?

—লা ইল্লাহা—রসুলাল্লা—

জিন জেগে উঠেছে, প্রেতমূর্তিরা মাথা তুলেছে চারদিকে। এ বাতাসের শব্দ নয়, তাদের আর্তনাদ; এ জলের গর্জন নয়, তাদের গোঙরানি; ফেনায় ফেনায় তাদেরই কঙ্কাল মুঠিগুলো মানুষের গলা টিপবার একটা লোলুপ উল্লাসে প্রসারিত হয়ে উঠেছে।

কালাবদরকে ভূতে পেয়েছে, পালাতে হবে এর কাছ থেকে! এ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ নয়, অলৌকিক সত্তার সঙ্গে। রহমান-রহিমতুল্লা! দাঁড়ের ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে হোঁচট খাওয়া মাতালের মতো অসংলগ্ন গতিতে চলেছে নৌকা—কফিলদ্দির হৃৎপিণ্ডটা কখন বুঝি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

হু হু হু হু। বাতাসের বিরাম নেই। উন্মত্ত কালোজলে মুহুর্মুহু ভেসে উঠছে রক্তাক্ত অক্টোপাসটা। নৌকার যাত্রী দুজন পরস্পরকে জড়িয়ে পড়ে আছে মূর্ছিতের মতো, আর অশরীরীদের সঙ্গে লড়াই করে অমানুষিক শক্তিতে দাঁড়ে ঝাঁকি মারছে কফিলদ্দি—আল্লা, আল্লা, নবী!

আকাশে মেঘের পর্দাটা আরো ঘন হয়ে চেপে বসছে। অন্ধকার। দুর্ভেদ্য, আদি অন্তহীন।

সোয়ারী নামিয়ে দিয়ে কফিলদ্দি ময়লা গামছা পেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। বেশ বেলা হয়েছে, মিষ্টি নরম রোদে ধুয়ে যাচ্ছে পৃথিবী, সোনা মেখে ঝলমলিয়ে উঠেছে কালাবদরের জল! দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই কোনোখানে।

এমন কিছু অসম্ভব দুর্যোগ নয়, তবু কাল রাত্রে কেন এত ভয় পেল কফিলদ্দি?

আর আশ্চর্য, তখনি একটা কথা বিদ্যুৎ চমকের মতো মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠল। সোজা হয়ে কফিলদ্দি উঠে বসল, সরিয়ে ফেললে পাটাতনের তক্তা একখানা। চোখে পড়ল শানানো মস্ত রামদা খানা সেখানে ঝকমক করছে।

আরো মনে পড়ল, মহাজনের দেনায় জ্বালাতন হয়ে কাল সে ক্ষেপে গিয়েছিল। কাল সে চেয়েছিল প্রথম ডাকাতি করতে, প্রথম

মানুষ খুন করে রক্তের আস্বাদ নিতে। কিন্তু কথাটা সে ভুলে গেল কেন? কাল রাত্রে কালাবদরের জলে যারা তাকে ভয় দেখিয়েছিল তারা কি প্রেতাত্মা? না, আল্লার ক্রোধ সহস্র সহস্র তর্জনী তুলে শাসন করেছিল তার পাপকে, তার মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ইবলিশকে? বিমূঢ়ের মতো রামদা খানার দিকে তাকিয়ে রইল কফিলদ্দি! কী আশ্চর্য, কথাটাকে এমন করে ভুলে গেল কেমন করে।

নরম রোদে অপূর্ব প্রশান্ত হয়ে গেছে কালাবদর। কফিলদ্দির নৌকার গায়ে কুল্ কুল্ করে সস্নেহ আঘাত দিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কাল নাগিনী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, শুনতে পেয়েছে কোন সাপ-খেলানো বাঁশির সুর।